সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ০৮ জুলাই ২০২৪ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ৩৯-৪০

www.weeklyarafat.com

DUBLIN MOSQUE

ডাবলিন মসজিদ, আয়ারল্যান্ড

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর

০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ’র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র ১

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ৩৯-৪০
✱ বার : সোমবার

◈ ০৮ জুলাই-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২৪ আষাঢ়-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ০১ মুহার্‌রম-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

✍ **সম্পাদকীয়** ০৩

✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**

❖ **প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বিধান**

আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪

✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**

❖ **ইসলামের সর্বোত্তম কাজ**

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯

✍ **প্রবন্ধ :**

❖ **ওহে মুসলিম! কারবালার ঘটনায় বাড়াবাড়ি কেন?**

আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী- ১৫

❖ **সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা**

মূল : ড. শাইখ সালিহ ফাউযান আল ফাউযান

অনুবাদক : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল- ১৯

❖ **কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**

মুহাম্মদ সাব্বির বিন জাব্বির- ২২

✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**

❖ **মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তার পুরস্কার**

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২৬

✍ **বিশেষ মাসায়িল** ২৭

✍ **সমাজচিন্তা :**

❖ **অহংকার ও পরিণতি**

আব্দুল্লাহ এম. আহমাদ- ২৮

✍ **কিশোর ভুবন :**

❖ **খলিফা মামুন ও প্রজ্ঞাবান বালিকা**

আরাফাত ডেস্ক- ৩৪

✍ **আলোকিত ভুবন** ৩৬

✍ **কবিতা** ৩৯

☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৪০

✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২

☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মুহাম্মদী মোহরাঙ্কিত আশুরায়ে মুহার্‌রম

হিজরি সনের প্রথম মাস মুহার্‌রম। এ মাসের দশম তারিখকে আশুরা বলা হয়। ইতিহাসে আশুরা প্রসিদ্ধ দিন। এই দিনে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ হয়। পৃথিবীর কুখ্যাত জালেম শাসক ফিরআউনের সলিলসমাধি হয়। অপরদিকে আল্লাহর নবী মূসা (আলায়হিস সালাম) ও নির্যাতিত বানী ইস্‌রা-ঈলের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। ফিরআউনকে মূসা নবী ও তাঁর ভ্রাতা হারুন (আলায়হিস সালাম) তাওহীদের দাওয়াত দেন। যুল্‌ম ও নির্যাতন বন্ধের আহ্বান করেন। কিন্তু ফিরআউন দম্ভভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তাই না, মূসা ও হারুন (আলায়হিস সালাম)-সহ নিরীহ বানী ইস্‌রা-ঈলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। আচমকা বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। জনৈক ব্যক্তি ডেকে বলে– হে মূসা (আলায়হিস সালাম)! দ্রুত প্রস্থান করুন! ফিরআউন বিশাল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আপনাদেরকে ধাওয়া করছে।

অবশেষে মূসা ও হারুন (আলায়হিস সালাম) তাদের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটলেন। কিন্তু পথে এক কঠিন পরীক্ষায় পড়লেন। সামনে বিশাল নদী এবং পিছনে ফিরআউন বাহিনী। বানী ইস্‌রা-ঈল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন : হে মূসা! আমরাতো ফিরআউন ও তার বাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়ে যাচ্ছি! আপনি একটি উপায় খুঁজুন! তৎক্ষণাৎ ঈমানের আলোকরশ্মি দীপ্ত প্রত্যয়দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী মূসা কালিমুল্লাহ (আলায়হিস সালাম) দৃঢ়চিত্তে বলে উঠলেন : কখনোই না, আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। তিনি আমাকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাওয়াক্কুল পূর্ণ এ উক্তির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা পথ বানিয়ে দিলেন। উত্তাল তরঙ্গের খরস্রোতা নদীর মাঝে ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আলায়হিস সালাম) তাঁর সাথীদের নিয়ে নিরাপদে ওপারে পাড়ি জমালেন।

এ দিকে দাম্ভিক ফিরআউনের সর্বনাশ ঘনিয়ে এলো। আল্লাহর কারিশমা বুঝতে পারলো না। সে চরম পরিণতি ভোগ করতে মু'যিজার পথ ধরে সদলবলে অগ্রসর এগিয়ে চলল। কিন্তু এ পথতো আর তার জন্য তৈরি করা হয়নি। মধ্যভাগে আসার পর পানি এসে পথ রুদ্ধ করলো। পালাবার পথ নেই। একান্ত নিরুপায় হয়ে বলে উঠলো– বানী ইস্‌রা-ঈল যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, আমিও সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু তার ঈমানের দাবি গৃহীত হলো না; বরং বলা হলো, এতক্ষণে! তুমি কত নাফরমানি করেছ(?) পরিত্রাণ মিলল না। সলিলসমাধি হলো। তার এ মর্মান্তিক মৃত্যু যুগে যুগে সব স্বৈরশাসক ও দাম্ভিকের জন্য মহা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। মূসা (আলায়হিস সালাম), তাঁর ঈমানদার ও নির্যাতিত জাতি ফিরআউনের যুল্‌ম থেকে মুক্তি পেল। মুক্তি বা বিজয়ি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাইতো এ বিজয়োল্লাসে সর্বপ্রকার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার একমাত্র হক্বদার হলেন আল্লাহ। এই কথা হৃদয় মন থেকে উপলব্ধি করে বিজয়ের এ তারিখে সিয়াম পালন করলেন এবং তার অনুসারীরাও এভাবে সিয়ামের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতায় অবনত হলো। এটাই হলো ১০ মুহার্‌রম বা আশুরার মুহাম্মাদী মোহরাঙ্কিত সত্য ঘটনা।

আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মক্কা জীবনে এ দিনে সিয়াম পালন করেছেন। আরবের কুরাইশরাও এ দিনে সিয়াম পালন করত। নবী (ﷺ) মদিনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন– সেখানের ইয়াহূদীরা এ দিন সিয়াম পালন করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন– এ দিনে তোমরা সিয়াম পালন করছো কেন? তারা বলল– এ দিন তো এক মহা দিন, যে দিন মূসা (আলায়হিস সালাম) ও তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের কবল থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফিরআউনের সলিলসমাধি হয়েছিল। তাই মূসা (আলায়হিস সালাম) মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে এ দিনে সিয়াম পালন করেছিলেন। আমরাও এ দিনের সিয়াম পালন করি। তৎক্ষণাৎ নবী (ﷺ) বলে উঠলেন : মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর অনুসরণের বিষয়ে তোমাদের চেয়ে আমি অধিক হক্বদার। এ কথা বলে তিনি আনুষ্ঠানিক সিয়াম পালন করলেন এবং সাহাবীগণকে সিয়ামের নির্দেশ দিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসূল (ﷺ)-এর মহাপ্রয়ানের ৫০ বছর পর ৬১ হিজরি সনের ১০ মুহার্‌রম কারবালার প্রান্তরে নবী দৌহিত্র হুসাইন ইবনু 'আলী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর এ মর্মান্তিক শাহাদাত সত্যিই হৃদয় বিধারক। সে জন্য তাঁরা আমাদের প্রাণ খোলা দু'আ থাকবে। কিন্তু আশুরার সিয়ামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর সালাফগণের পরিগৃহিত নীতি অনুযায়ী আমরা ইয়াজিদকে গালমন্দ করবো না এবং তার জন্য কোনো দু'আও করবো না; বরং বিরত থাকবো। ☐

আল কুরআনুল হাকীম

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বিধান

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ
اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ
وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ
بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾

শাব্দিক অনুবাদ

يَا শব্দটি حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বান সূচক অব্যয়। الَّذِيْنَ এটি اسم موصول অর্থ- যারা। শব্দটি দু'দিক مندى ও معرفة الاسماء موصولة হওয়ার কারণে এবং ال যুক্ত হওয়া فاصلة হিসেবে اَيُّهَا যুক্ত হয়েছে। আর اٰمَنُوْا অর্থ- তারা ঈমান এনেছে। لَا تَتَّخِذُوْٓا তোমরা ধারণ/গ্রহণ করো না, اٰبَآءَكُمْ তোমাদের পিতাকে, وَ এবং اِخْوَانَكُمْ তোমাদের ভাইদেরকে اَوْلِيَآءَ বন্ধু اِنِ যদি اسْتَحَبُّوْا তারা ভালোবাসে الْكُفْرَ কুফ্‌রকে عَلَى الْاِيْمَانِ ঈমানের উপর مَنْ যে ব্যক্তি يَّتَوَلَّهُمْ তাদেরকে ভালোবাসবে مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে فَاُولٰٓئِكَ তারা هُمُ الظّٰلِمُوْنَ তারাই অত্যাচারী قُلْ তুমি বলো اِنْ যদি كَانَ হয় اَبْنَآؤُكُمْ তোমাদের সন্তানগণ اَزْوَاجُكُمْ তোমাদের স্ত্রীগণ عَشِيْرَتُكُمْ তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা اَمْوَالُ ۨ মাল-সম্পদ اقْتَرَفْتُمُوْهَا যা তোমরা অর্জন করেছ تِجَارَةٌ ব্যবসা-বাণিজ্য تَخْشَوْنَ তোমরা ভয় করো كَسَادَهَا যার মন্দা হওয়ার مَسٰكِنُ বাসগৃহ বা ঘর-বাড়ীসমূহ تَرْضَوْنَهَآ যা তোমরা পছন্দ করো اَحَبَّ اِلَيْكُمْ তোমাদের কাছে অধিক ভালোবাসার مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হতে وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ এবং তাঁর পথে জিহাদ হতে فَتَرَبَّصُوْا তবে তোমরা অপেক্ষা কর حَتّٰى যতক্ষণ না يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ আল্লাহ তাঁর ফায়সালা দেন وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى আর আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না الْقَوْمَ জাতীকে বা লোকদেরকে الْفٰسِقِيْنَ সত্যত্যাগী-ফাসিক।

সরল বঙ্গানুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের পিতা আর ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফ্‌রীকে বেশি ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারাই হচ্ছে অত্যাচারী-যালিম। (হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও : যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের নিজগোষ্ঠী ও তোমাদের অর্জিত সম্পদ আর ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো, যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যগী-ফাসিক সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"[1]

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াতদ্বয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের ৯ নং সূরা, সূরা আত্ তাওবাহ্ হতে চয়ন করা হয়েছে। এগুলো সূরা তাওবার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত।

সূরার নামকরণ : এই সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত। একটি সূরা তাওবাহ্ অপরটি– সূরা বারাআত। তাওবাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা বা পাপ মুচন। এই সূরার একস্থানে কতিপয় ঈমানদার লোকদের তাওবাহ্ কবুল ও পাপ মুচনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই এ সূরার

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[1] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ২৩-২৪।*

সূচীপত্র

নামকরণ করা হয়েছে সূরা আত্ তাওবাহ্। আর বারাআত শব্দের অর্থ হলো– সম্পর্কচ্ছেদ বা সম্পর্ক ছিন্ন করা। যেহেতু এ সূরার শুরু হয়েছে মু'মিন ও মুশরিকদের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে। তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে– সূরা বারাআত। শিরোনাম হিসেবে নয় শব্দগুলো দিয়ে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আর যা করা হয়েছে তা ওয়াহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট : আয়াত দু'টিতে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাপনায় মু'মিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবার, প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজন থেকেও মহান শ্রষ্টাকে বেশি ভালোবেসে তার পথে যুদ্ধ ও জিহাদে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নু'মান ইবনু বশির থেকে বর্ণিত আছে–

তিনি একবার জুমু'আরর দিন কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদে নববীর মিম্বরের পাশে বসে ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি পান করানোর মতো মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো 'আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোনো 'আমলের ধার আমি ধারি না। তার এ দাবি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম 'আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। তখন 'উমার (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূল (ﷺ)-এর মিম্বরের কাছে এরূপ গণ্ডগোল বন্ধ করো এবং জুমু'আর নামাযের পর স্বয়ং রাসূল (ﷺ)-এর কাছে বিষয়টি পেশ করো। এরপর বিষয়টি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে পেশ করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পানের উপর মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[২]

ঘটনা যাই হোক না কেন আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে মূলত মুশরিকদের অহংকার নিবারণের উদ্দেশ্যে। আর ২৪ নং আয়াতটি নাযিল হয় মূলত ওদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফর্‌য হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ী-ঘরের মায়া যাদেরকে হিজরত থেকে বিরত রেখেছিল।

প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব : ভালোবাসা বা প্রেম হলো একটি সম্পর্কের নাম। যা নির্ভর করে আত্মবিশ্বাসের ওপর। আর বন্ধুত্ব হলো মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। বন্ধুত্ব মানেই যেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ নিংড়ে ভালোবাসা দিয়ে মন খুলে কথা বলা। আত্মার শক্তিশালী বন্ধন হলো এই বন্ধুত্ব। ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দু'টি সম্পর্ক একই সুতোয় গাঁথা। কোনো কোনো সময় এই সম্পর্ক একজন মানুষের সকল প্রকারের রীতিনীতিকে তছনছ করে দেয়। তাই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে সকলকে সচেতন হতে হবে। বন্ধু হয়ে যে আসবে সে যেন কোনো রকমের ক্ষতি করতে না পারে সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সংকট ও অনাকাঙ্খিত সকল পরিস্থিতি মোকাবেলায়। তাই মহান স্রষ্টা এই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের একটি নির্দিষ্ট সীমা-রেখা টেনে দিয়েছেন। দিয়েছেন কিছু বিধি-নিষেধ। মু'মিন বান্দাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতিরেকে অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অন্যথায় তারা তোমাদের ক্ষতি করতে ত্রুটি করবে না। তোমরা যাতে বিপন্ন হও তারা তো তাই কামনা করে। বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয় এবং তাদের অন্তরে যা লুকায়িত তা আরও গুরুতর।"[৩]

এক ধরনের বন্ধুত্ব বন্ধুকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং এর উপর উৎসাহ যোগায়। অপর ধরনের বন্ধুত্ব বন্ধুকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সেটার উপর

---

[২] *সহীহ মুসলিম।*

[৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১১৮।*

উদ্দীপনা দিতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিফাযত করতে ইচ্ছে করেন তিনি ব্যতীত সে বন্ধুত্বের অকল্যাণ থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই।[৪]

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের পিতা আর ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফ্‌রীকে বেশি ভালোবাসে।"

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা : পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার কথা কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এর একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। মু'মিনগণ শুধু মু'মিনদের সাথেই প্রকৃত বন্ধুত্ব করবে। কোনো কাফির-মুশরিকের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কোনো অবস্থাতেই একজন মু'মিনের জন্য জায়িয নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "মু'মিনগণ যেন মু'মিন ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।"[৫]

কেননা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঈমানের সাথে একত্রিতভাবে থাকতে পারে না। ঈমান তো শুধু আল্লাহ ও মহান আল্লাহর বন্ধু মু'মিনদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বলে যারা মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে এবং মহান আল্লাহর শত্রুদের সাথে জিহাদ করে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে তাগুত তথা কুফ্‌রী শক্তিকে বেশি ভালোবেসে তাদেরকে বন্ধু, হিতাকংখী বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তাদের মুহাব্বত ও ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এই দু'সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে সকল ভালোবাসা-মুহাব্বত ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। এটাই প্রকৃত ঈমানের দাবি। রাসূল (ﷺ) বলেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষায় অধিকতর প্রিয়তম হয়েছি।[৬]

এটা শুধু ঈমানের দাবিই নয়; বরং ঈমানের পরিপূর্ণতার উপকরণও। যেমন রাসূল (ﷺ) অন্য হাদীসে বলেছেন–

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, মহান আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করল, মহান আল্লাহর জন্য কাউকে দান করল এবং মহান আল্লাহর জন্য কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।[৭]

এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামা'আত সাহাবায়ে কিরাম ঈমানের এই পূর্ণতা লাভ করেছেন। তারা সর্বক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিতেন যা বদর ও উহুদ যুদ্ধে বাপ-ছেলে ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে প্রচণ্ড অস্ত্রের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে যারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তারাই হচ্ছে অত্যাচারী, যালিম।"

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾

---

[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৯৮।*

[৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২৮।*

[৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৮।*

[৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৬৮৩।*

অর্থাৎ- “নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত সোনা রূপার ভাণ্ডার, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে।”[৮] অতএব এদের প্রতি আসক্ত হওয়া দুষণীয় নয়। তবে শর্ত হলো– তা মধ্যম পন্থায় এবং শরিয়তের গণ্ডির ভিতর হতে হবে। কেউ যদি এ সীমা অতিক্রম করে তবেই সেই হবে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতাংশে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ থেকে এগুলোকে প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য কঠোর সাবধানবাণী দেয়া হয়েছে। আর এটি চেনার উপায় হচ্ছে, যদি দু’টি বিষয় থেকে একটি নিজের মনের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। আর অপরটি নিজের মনের পক্ষে কিন্তু তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি রয়েছে, এমতাবস্থায় সে যদি নিজের মনের পছন্দের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় তবে বুঝা যাবে যে, সে যালিম। তার উপর যা ওয়াজিব ছিল সেটাকে সে ত্যাগ করেছে।[৯]

পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, তবে এটা হবে প্রকৃত ত্যাগ ও কুরবানী।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ﴾

“(হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও : যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের নিজগোষ্ঠী ও তোমাদের অর্জিত সম্পদ আর ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো, যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, (তাহলে অপেক্ষা করো)।”

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের কাছে খুবই প্রিয় ও আকর্ষণীয় মোট ৮টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ৫টি হলো পাত্রগত। আর ৩টি হলো বস্তুগত। ৫টি পাত্রগত হলো– **১.** বাবা-মা, **২.** ছেলে-মেয়ে, **৩.** ভাই-বোন, **৪.** স্বামী-স্ত্রী এবং **৫.** অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। আর বস্তুগত ৩টি হলো– **১.** ধন-সম্পদ, **২.** ব্যবসা-বাণিজ্য এবং **৩.** বাড়ী-ঘর। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের কাছে এসব পাত্রগত ও বস্তুগত জিনিসকে দুনিয়াবি জীবনে অত্যান্ত আকর্ষণীয় ও লোভাতুর করে তৈরি করেছেন। আর এটাই তো হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরীক্ষা। যেমন পরীক্ষা করেছিলেন ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-কে। তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমা‘ঈল (আলায়হিস সালাম)-কে কুরবানী করার জন্য। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করার জন্য। আর এই কুরবানী ও হিজরত করতে হলে উল্লেখিত ৮টি পাত্রগত ও বস্তুগত সকল কিছুই ত্যাগ করতে হয়। আর যারাই এই ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারে না তাদের দ্বারাই দুনিয়ার ঐসব লোভাতুর ও আকর্ষণীয় জিনিসের মুহাব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত উপেক্ষিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ﴾ؕ

“তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।”

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা-

এক. মুজাহিদ বলেন– এখানে “বিধান” মানে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা বিজয়ের আদেশ। তার দৃষ্টিতে বাক্যের সারমর্ম হলো– যারা দুনিয়াবি সম্পর্কের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজয় হবে তখন এসব নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, তখন দুনিয়াবি সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসবে না।

দুই. হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন– এখানে “বিধান” মানে মহান আল্লাহর ‘আযাব। অর্থাৎ- আখিরাতের

---

[৮] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৪।*

[৯] *তাফসীর সা‘দী।*

সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়ার সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে। মহান আল্লাহর ‘আযাব অতি শীঘ্রই তাদেরকে গ্রাস করবে। দুনিয়াতেই এ ‘আযাব আসতে পারে। না হলে আখিরাতের ‘আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি মূলত হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে জিহাদের। যা হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। বর্ণনা ভঙ্গীতে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হলো এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসছে জিহাদের নির্দেশ, যে নির্দেশ পালন করতে যেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সকল জিনিসের মায়া-মুহাব্বত, এমনকি নিজের জীবনের ময়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

তিন. আবূ আ’লা মওদুদী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এখানে “বিধান” বা ফয়সালা অর্থ- পদচ্যুতি। অর্থাৎ- তোমাদের এ ব্যর্থতার জন্য তোমাদেরকে পদচ্যুত করে সত্যিকারের দ্বীনদার এবং দ্বীনের ব্যাপারে নেতৃত্বের অধিকারী অপর কোনো দল বা লোকের হাতে আল্লাহ তা‘আলা দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾

“আর আল্লাহ সত্যত্যাগী-ফাসিক সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।”

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে যে, যারা হিজরতের নির্দেশ আসার পরেও দুনিয়াবি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত থেকেছে তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোনো ফল ভোগ করতে দিবে না এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিজ ঘরে আরাম-আয়েশ ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে তাও পূরণ হবে না; বরং জিহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তারা ফাসিক। আর মহান আল্লাহর নিয়ম হলো- তিনি কোনো নাফরমান লোকের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণ করবেন না।

আমাদের শিক্ষা

এক. সবকিছুতেই একটি সীমা থাকা উচিৎ। আবেগে আপ্লুত হয়ে কারো প্রতি এতটুকু আকৃষ্ট হওয়া যাবে না; যতটুকু আকৃষ্টের ফলে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধাগ্রস্ত হয়; পরকাল হয় উপেক্ষিত। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মর্যাদা-মূল্যায়ণ ক্ষুন্ন হয়।

দুই. প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব হলো একটি নয়ণপ্রীতিকর সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের মাধ্যমেই আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তার বান্দাকে পরিক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে চান দুনিয়াবি এ সম্পর্কে জড়িয়ে কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্কের জলাঞ্জলি দেয়। যে এমনটা করে সে হয় যালিম ও ফাসিক। যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা কখনো হিদায়াত দেন না।

তিন. ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন মানুষের সাথে স্থাপন করা যাবে না, যারা কুফ্‌রী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চার. কুফ্‌রী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি নিজের স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোনও হয় তবুও তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তবে বৈষয়িক ক্ষেত্রে তাদের সাথে সদভাব ও সদাচার বজায় রাখতে হবে।

পাঁচ. পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ী-ঘর এ সকলের ভালোবাসা-মুহাব্বতের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে স্থান দিতে হবে। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

ছয়. দুনিয়াবি সকল অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বকে পরিহার করে পুতঃপবিত্র জীবন গঠন করতে হবে। সর্বপরি মহান স্রষ্টার বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা-তদবীর জীবনভর চালিয়ে যেতে হবে।

সাত. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাতেই রয়েছে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা। এর বিপরীতে ছলনাময়ী প্রেম-ভালোবাসা ও অবৈধ বন্ধুত্বে জড়িয়ে জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া যাবে না।

যারাই এগুলোতে জড়িয়েছে তাদের অনেকেই যিনা-ব্যবিচারে লিপ্ত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে কিংবা নেশাগ্রস্ত-মদখোর ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে, প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে ব্যর্থ হয়ে তাদের অনেকে আত্মহত্যার মতো জঘন্য ও নির্মম পথ বেছে নিয়েছে। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ০৮ জুলাই- ২০২৪ ঈ. ❖ ০১ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

ইসলামের সর্বোত্তম কাজ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ (رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا)، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

সরল অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করল, ‘সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?’ তিনি বললেন, “(ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে।”[১০]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

তাঁর নাম ‘আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস। মাতার নাম রীতা বিনতুল মুনাব্বিহ। তাঁর বংশধারা হলো– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস ইবনু ওয়ায়েল ইবনু হিশাম ইবনু সুয়াইদ ইবনু সাহাম ইবনু ‘আম্‌র ইবনু হুসাইন ইবনু কা’ব ইবনু লুয়াই ইবনু গালিব আল করশিস সাহমী। তাঁরা কুরাইশ বংশের একটি শাখা বংশ। তিনি স্বীয় পিতা ‘আম্‌রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সুদক্ষ কুটনীতিক। পিতা ও পুত্র উভয়ই মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন। মহানবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় প্রায় সকল যুদ্ধে তাঁর পিতা স্বীয় নেতৃত্বের ঝাণ্ডা পুত্র ‘আব্দুল্লাহ’র হাতে তুলে দেন।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম এবং ‘আব্দুল্লাহ নামের ফকীহগণের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০ মতান্তরে ৬০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ১৭টি। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮টি এবং ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেছেন ২০টি। তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার, আবুদ দারদা, মু‘আয ও ‘আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবূ উমামাহ্, মিসওয়ার, সায়েব ইবনু ইয়াযিদ, আবুত তুফায়েল, সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আবূ সালামাহ্, ‘আত্বা, মুজাহিদ, ‘উরওয়াহ্ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

তাঁর ইন্তেকালের স্থান ও সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরি ৬৩ সনে মদিনায় ‘হাররা’ যুদ্ধকালে কোনো এক রাতে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে ৭৩ হিজরিতে অথবা ৬৭ হিজরিতে অথবা ৫৫ হিজরিতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

হাদীসের ব্যাখ্যা

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ».

‘সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?’ তিনি বললেন, “(ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে।”

মানুষকে খাওয়ানো, অনাহারির আহারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর একটি। এ কারণেই ইসলাম ধর্মে মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করাকে উত্তম ইসলাম বলা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে, তাদের

প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[১০] সহীহুল বুখারী- হা. ১২, ২৮, ৬২৩৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৩৯; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৮৫৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫০০০; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫১৯৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩২৫৩, ৩৬৯৪; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬৫৪৫, ৬৮০৯; আদ্ দারেমী- হা. ২০৮১।

খাবারের ব্যবস্থা করে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের সুনাম করেছেন, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا﴾

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফূর (কর্পুর)। এমন একটি ঝর্ণা যা হতে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা এই ঝর্ণাকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের অনিষ্টতা হবে ব্যাপক। এবং খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে, (এবং বলে–) শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন।"[১১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খাওয়ানোর নীতিমালা বাতলে দিয়েছেন। সেগুলো হলো–

এক. মানুষকে খাওয়াতে হবে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

দুই. এর বিনিময়ে কখনো তাদের কাছে কোনো প্রতিদানের আশা করা যাবে না।

তিন. আশাও করা যাবে না যে, তারা আমার গুণগান গাইবে।

চার. মানুষকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তাক্বওয়া থাকতে হবে। আল্লাহভীতি থাকতে হবে। তবেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করবেন। কিন্তু আমরা যদি মানুষকে সামান্য কিছু খাইয়ে খোঁটা দেওয়া আরম্ভ করি, তাদের থেকে বিভিন্ন সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করি বা এটি ব্যবহার করে বিদেশি অর্থ বা কোনো সুযোগ-সুবিধার আশা করি, তাহলে বুঝতে হবে, এই 'ইবাদতকে শয়তান বানচাল করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই সব সময় মানুষকে খাওয়ানোর পাশাপাশি এই বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকতে হবে।

অনেকে মনে করতে পারে, আমার সামর্থ্য নেই, আমি কোত্থেকে খাওয়াব? আমি নিজেই তো অভাবে আছি। তাদের উদ্দেশে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ○ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ○ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ○ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ﴾

"অথবা, দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান; কোনো ইয়াতীম, আত্মীয়কে, অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে, তারপর তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া করুণার; এরাই ডান হাতওয়ালা (সৌভাগ্যবান)।"[১২]

তাই আমাদের উচিত, সক্ষমতা ও সামর্থ্য নিয়ে হীনম্মন্যতায় না ভুগে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা। হয়তো এর অসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের সামর্থ্য বাড়িয়ে দিতে পারেন। তাছাড়া উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি নিয়ম করে মহান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা যায়, এর উপকারিতা খুব দ্রুতই টের পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে উপার্জনে বরকত হয়।

রাসূল (ﷺ) মদিনায় গমন করে সর্বপ্রথম যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি ছিল মানুষকে খাওয়ানো!

---

[১১] *সূরা আদ্ দাহ্র : ৫-১১।*

[১২] *সূরা আল বালাদ : ১৪-১৮।*

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ০৮ জুলাই- ২০২৪ ঈ. ❖ ০১ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

ক্ষুধার্তকে খাবার দান করার মাধ্যমে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। এতে আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আবার তাদের কষ্ট লাঘবের কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বিভিন্ন কষ্ট লাঘব করে দেবেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-ও অনাহারিদের খাবারের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাই পৃথিবীতে ও পরকালে গরিব, অসহায় ও ক্ষুধার্তকে খাবারদানকারী রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যকারী বলে গণ্য হবেন। রাসূল (ﷺ) ক্ষুধার্তকে খাবার দান করতে কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ভিক্ষুক (ক্ষুধার্তকে) কিছু না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও।'[১৩]

নবীজি (ﷺ) আরও বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়, যে নিজে পেটপুরে আহার করে; কিন্তু তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।'[১৪]

তিনি আরও বলেন,

"إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُورِهَا". فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ".

"জান্নাতের মধ্যে একটি বালাখানা (প্রাসাদ) আছে। এর ভিতর হতে বাইরের এবং বাহির হতে ভিতরের দৃশ্য দেখা যায়। এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। এই বালাখানা কোন ব্যক্তির জন্য? তিনি বললেন : যে লোক মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়, সর্বদা রোযা পালন করে এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে তার জন্য।[১৫]

রাসূল (ﷺ) বলেন,

وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে।"

সালাম প্রদানের আর একটি আদব হলো সকল মুসলমান পরস্পরকে সালাম দিবে। চাই সে দেশী হোক কিংবা বিদেশী, শ্বেত হোক কিংবা কালো হোক, পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত হোক, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়। কারণ রাসূল (ﷺ) বিশেষ বিশেষ লোক বা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সালাম দিতে নিষেধ করেছেন।

'সালাম' শব্দটি আরবী এবং তা বাবে 'তাফঈল'-এর মাছদার। 'আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান' অনুযায়ী সালামের আভিধানিক অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সালাম ও অভিবাদন। অর্থাৎ- 'আস-সালামু 'আলাইকুম' অর্থ হলো আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

শরিয়তের পরিভাষায়– একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের সাথে সাক্ষাতের সময় যে বাক্য দ্বারা অভিবাদন জানায়, স্বাগত জানায় এবং ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও দু'আ কামনা করে, তাকেই আমরা সালাম বলে থাকি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।"[১৬]

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةً مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً﴾

অর্থাৎ- "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন।"[১৭]

---

[১৩] *আহমাদ- হা. ১৬৬৯৯; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫৬৫।*
[১৪] *বায়হাক্বী- হা. ৩৩৮৯।*
[১৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৮৪।*

[১৬] *সূরা আন্ নূর : ২৭।*
[১৭] *সূরা আন্ নূর : ৬১।*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوْهَا﴾

অর্থাৎ- “যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করো অথবা ওরই অনুরূপ করো।”[১৮]

তিনি আরো বলেছেন,

﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ ٱلْمُكْرَمِيْنَ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰ﴾

অর্থাৎ- “তোমার নিকট ইব্‌রা-হীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ‘সালাম’। উত্তরে সে বলল, ‘সালাম’।”[১৯]

সালামের বাক্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নির্বাচন করেছেন। আদম সন্তানদের জন্য এই বাক্যকেই তাহিয়্যাহ তথা অভিবাদনস্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। এ বাক্যের ভাব ও ভাষা, শব্দ ও সৌন্দর্য তুলনাহীন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা আদম (আলায়হিস সালাম)-কে সৃষ্টির পর বললেন–

اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوْهُ : وَرَحْمَةُ اللهِ.

যাও! ফেরেশ্‌তাদের ওই দলকে সালাম দাও এবং খেয়াল করে শুনো তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়; কারণ, এটিই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের সালাম অভিবাদন। তখন আদম (আলায়হিস সালাম) বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। ফেরেশ্‌তারা জবাবে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ। ফেরেশ্‌তারা وَرَحْمَةُ اللهِ বাড়িয়ে বললেন।[২০]

রাসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের সাতটি ওয়াসীয়াত করেছিলেন, যেন তাঁরা সামাজিক জীবনে তা আঁকড়ে থাকেন। তাদের পরে উম্মতে মুসলিমাও যেন তা ধরে রাখে। তার মধ্যে একটি হলো সালাম।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (ؓ) قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِيْ الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ.

বারা ইবনু ‘আযিব (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজের– রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচি দাতার জন্য দু‘আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলূমের সাহায্য করা, সালাম প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন (সাতটি কাজ থেকে) রূপার পাত্রে পানাহার, স্বর্ণের আংটি পরিধান, রেশমী যিনের উপর সাওয়ার হওয়া, মিহিন রেশমী বস্ত্র পরিধান, পাতলা রেশম বস্ত্র ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান বস্ত্র পরিধান এবং গাঢ় রেশমী বস্ত্র পরিধান করা।[২১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيْلَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَجِئْتُ فِيْ النَّاسِ لأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন, মানুষ তখন দলে দলে তার নিকট দৌড়ে গেল। বলাবলি হতে লাগলো যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসেছেন,

---

[১৮] *সূরা আন্ নিসা : ৮৬।*

[১৯] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ২৪-২৫।*

[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৪১।*

[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৩৫।*

সূচীপত্র

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসেছেন। অতএব তাকে দেখার জন্য আমিও লোকদের সাথে উপস্থিত হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোনো মিথ্যুকের চেহারা নয়। তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বললেন তা এই– হে মানুষগণ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান করো এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করো। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহীহ-সালামতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২২]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবেই সালামকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পরিচিত-অপরিচিত সবার মাঝে। পরিচিত কাউকে যখন সালাম দেওয়া হয়, তা আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা অন্য যে কোনো সূত্রেই হোক, সালামের মাধ্যমে সেই পরিচয়ের সূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আর অপরিচিত কাউকে যখন কেউ সালাম দেয় তখন এ সালামের মধ্য দিয়েই সূচিত হতে পারে গভীর আন্তরিকতার। জীবনে কখনো দেখা হয়নি এমন কারও সঙ্গেও যখন কথাবার্তার শুরুতে সালামের আদান-প্রদান হয় তখন অকৃত্রিম হৃদ্যতা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। এক অপার্থিব শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভূত হয়। মোটকথা, সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। ভালোবাসা ও সম্প্রীতির এ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক বন্ধন যেমন সুদৃঢ় হয় তেমনি পরকালীন মুক্তিও এর সঙ্গে জড়িত।

কথা বলার আগেই সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর নিকটে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়।’[২৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– আবূ উমামাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! দু’জন লোকের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে কে প্রথম সালাম দিবে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার বেশি নিকটবর্তী।[২৪]

প্রথমে সালাম না দিলে রাসূল (ﷺ) কথা বলার অনুমতি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.

‘যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় না তোমরা তাকে (কথা বলার) অনুমতি দিও না।’[২৫]

চলমান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, আরোহী পদচারী ব্যক্তিকে, কমসংখ্যক লোক অধিকসংখ্যককে এবং ছোটোরা বড়দেরকে সালাম দিবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

‘আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্পসংখ্যক অধিকসংখ্যককে সালাম দিবে।’[২৬]

অন্যত্র তিনি বলেন,

يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

‘ছোটোরা বড়দেরকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্পসংখ্যক অধিকসংখ্যককে সালাম দিবে।’[২৭]

প্রখ্যাত সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার বিদ্বান সাহাবীদের অন্যতম। তাকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে ওঠে হাদীস চর্চার পাঠশালা। অথচ তিনি হাদীসের মজলিস রেখে মাঝে মাঝেই বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। উদ্দেশ্য অধিক সংখ্যক মানুষকে সালাম দেওয়া। তাঁর শিষ্য তুফায়ল ইবনু উবাই ইবনু ক্বা’বের বক্তব্য শুনুন–

আমি একদিন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট এলাম। তিনি তখন আমাকে নিয়ে বাজারের

---

[২২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৩৪, ৩২৫১; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৮৫।*

[২৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫১৯৭; সহীহাহ্- হা. ৩৩৮২; সহীহুল জামে‘- হা. ৬১২১।*

[২৪] *আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৯৪; মিশকাত- হা. ৪৬৪৬।*

[২৫] *সহীহাহ্- হা. ৮১৭; সহীহুল জামে‘- হা. ৭১৯০।*

[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৩২; সহীহ মুসলিম- হা. ২১৬০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৬৩২।*

[২৭] *বুখারী- হা. ৬২৩৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৬৩৩।*

দিকে রওনা করলেন। আমি তাকে বললাম, বাজারে গিয়ে আপনি কী করবেন? আপনি তো কোনোকিছু কেনাবেচা করেন না, কোনো পণ্য সম্পর্কে কিছু জানতেও চান না, কোনোকিছু নিয়ে দামাদামিও করেন না, কারও সঙ্গে কোনো বৈঠকেও শরিক হন না, তবুও কেন আপনি বাজারে যাবেন? আপনি এখানে বসুন, আমরা হাদীস শুনব। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তখন বললেন, আরে শুনো, আমরা তো কেবল সালাম দেওয়ার জন্যেই বাজারে যাই। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই আমরা সালাম দিয়ে থাকি।[২৮]

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

আবূ আইয়্যূব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) বলেছেন : কোনো মুসলিমের পক্ষে তার কোনো ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয় যে, তাদের দু’জনের দেখা সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে, আরেকজন অন্যদিকে চেহারা ঘুরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথম সালাম করবে।[২৯]

উপসংহার

ইসলামে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা ক্ষুধার্ত-দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী বান্দা হিসেবে গণ্য হতে পারি। ক্ষুধার্তকে খাবার দান করার মাধ্যমে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। এতে আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আবার তাদের কষ্ট লাঘবের কারণে আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন বিভিন্ন কষ্ট লাঘব করে দেবেন।

সালাম যে কেবল অভিবাদন আর শুভ কামনা এমন নয়, কিংবা সালাম কেবল মুহাব্বত-ভালোবাসার প্রকাশই নয়; বরং এ সালামের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার দাবিটুকুও আদায় করা হয়। একজন আরেকজনের জন্যে প্রার্থনা করে– আল্লাহ তোমাকে শান্তি ও নিরাপদে রাখুন, তোমার ওপর বর্ষিত হোক পরম করুণাময়ের দয়া ও অনুগ্রহের বারিধারা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে দয়াময় আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সবরকমের বিপদ ও শঙ্কা থেকে মুক্ত রাখুন। সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের জন্যে এ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেন একথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়– আমরা একে অপরের যে সহযোগিতা আর উপকার করতে চাই, তা কেবল মহান আল্লাহর ইচ্ছায়ই হতে পারে। এভাবে সালামের মাধ্যমে একে অন্যকে মহান আল্লাহর কথাও মনে করিয়ে দেয়। আর কেউ যখন অন্য কারও জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করে, সে যেন এর ভেতর দিয়ে এ অঙ্গীকারও করে– আমার পক্ষ থেকেও কোনো অনিষ্টতায় তুমি আক্রান্ত হবে না। আমার দিক থেকে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। পারস্পরিক ভালোবাসার দাবি পূরণের চেয়ে সুন্দর পন্থা আর কী হতে পারে! ❑

মৃত্যু সংবাদ

সাপ্তাহিক আরাফাত-এর কম্পিউটার অপারেটর **নূর ইসলাম শিপলু**’র মমতাময়ী মাতা **দোলারী বেগম (৬২)** গত ৬ জুলাই শনিবার সকাল ৯ ঘটিকায় পুরাতন ঢাকার নিজ বাড়িতে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেছেন– “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু। মাইয়্যিতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বংশাল-মুকিম বাজার জামে মসজিদে। ইমামতি করেন বংশাল বড়ো জামে মসজিদের খতিব **শাইখ হুসাইন বিন সোহরাব**। অতঃপর তাকে পুরাতন ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে সকল মুসলিমকে সাপ্তাহিক আরাফাত দফতর থেকে দু‘আ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা মাইয়্যিতকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবূল করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন –আমীন।

---

[২৮] *মু‘আত্তা মালিক- হা. ১৭২৬।*

[২৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৩৭।*

সূচীপত্র

ওহে মুসলিম! কারবালার ঘটনায় বাড়াবাড়ি কেন?

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী[*]

প্রতি বছর মুহার্‌রম মাস আসলেই মুসলিম নামধারী একটি গোষ্ঠি ইসলামের ইতিহাসের একটি রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে মেতে উঠে। সেটা হচ্ছে ৬১ হিজরির মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে ইরাকের কারবালায় রাসূল (ﷺ)-এর পবিত্র দৌহিত্র হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র শাহাদাত ও তাঁর পরিবারের বেশ কিছু সদস্যের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। এটাকে কেন্দ্র করে তারা এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, তাতে মনে হয় ইসলামের ইতিহাসে এছাড়া আর কোনো ঘটনা নেই। আশুরার দিন তারা তাজিয়া মিছিল, মাতম এবং ইসলামী ‘আক্বীদাহ্ বিরোধী আরো অনেক কিছুই করে থাকে। এ বিষয়ে তাদের প্রচারণা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী শুনে সুন্নী মুসলিমদের অনেকেই ধোঁকা খায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ী হুসাইন বা অন্য কারও মৃত্যুতে মাতম করা কিংবা তিনদিনের বেশি শোক পালন করা জায়িয নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মুসলিম নামধারি এক শ্রেণীর মানুষ ৬১ হিজরির মুহার্‌রমের দশ তারিখে কারবালায় হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) নিহত হওয়ার কারণে শতশত বছর যাবৎ শোকদিবস হিসেবে পালন করে আসছে। সেই সঙ্গে তারা আশুরার পবিত্রতাকে জড়িয়ে দিচ্ছে। শিয়া-রাফেযীদের প্রচারণা, মিথ্যা কাহিনী ও বাড়াবাড়ির কারণে যেসব সুন্নী মুসলিম হুসাইনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনায় ধ্রুম্রজালে আটকে পড়েছেন, তাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করছি। যারা কারবালার সঠিক ঘটনা ও প্রকৃত তথ্য না জানার কারণে এ ব্যাপারে সন্দিহান ও বিভ্রান্তিতে আছেন, তারা প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝলে নিজে নিজেই প্রকৃত ঘটনা সহজভাবে বুঝে যাবেন ইন্‌শা-আল্লাহ। সেই সঙ্গে কারবালার ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয়টাও সহজভাবেই বুঝা যাবে।

প্রথম প্রশ্ন : হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র পিতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা ‘আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হুসাইনের চেয়ে অধিক উত্তম ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরি সালে রমাযান মাসের ১৭ তারিখ জুমু‘আর দিন ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় ‘আব্দুর রহ্‌মান ইবনু মুলজিম নামক খারেজীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। তারা হুসাইনের মৃত্যু দিবস উদযাপনের ন্যায় তাঁর পিতার মৃত্যু উপলক্ষে মাতম করে না কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদাহ্ অনুযায়ী ‘উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) ছিলেন ‘আলী ও হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র চেয়ে উত্তম। তিনি ৩৬ হিজরি সালে যুলহাজ্জ মাসের আইয়্যামে তাশরীকে স্বীয় বাস ভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় মাজলুমভাবে নিহত হন। ন্যায় পরায়ণ এই খলীফাকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তারা তাঁর হত্যা দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করে না কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন : এমনিভাবে খলীফাতুল মুসলিমীন ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) ‘উসমান এবং ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকেও উত্তম ছিলেন। তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে জামা‘আতের ইমামতি করছিলেন। এমন অবস্থায় আবূ লুলু নামক একজন অগ্নি পূজক তাঁকে দু’দিকে ধারালো একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে। সাথে সাথে তিনি ধরাশায়ী হয়ে যান এবং তিন দিন পর শহীদ হন। লোকেরা সেই দিনে মাতম করে না কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম খলীফা এবং রাসূলের বিপদের দিনের সাথী আবূ বক্‌র (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র মৃত্যু কি মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক নয়? তিনি কি রাসূলের পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন না? তার মৃত্যু দিবসে তারা তাজিয়া করে না কেন?

পঞ্চম প্রশ্ন : সর্বোপরি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত বানী আদমের সরদার।

---

[*] *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

আল্লাহ তাঁকে অন্যান্য নবীদের ন্যায় স্বীয় সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। সাহাবীদের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কোনো মুসীবত ছিল না। তিনি ছিলেন তাদের কাছে স্বীয় জীবন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয়। তারপরও তাদের কেউ রাসূলের মৃত্যুতে মাতম করেননি। হুসাইনের প্রেমে মাতালগণকে রাসূলের মৃত্যু দিবসকে উৎসব ও শোক প্রকাশের দিন হিসেবে নির্ধারণ করতে দেখা যায় না কেন?

ষষ্ঠ প্রশ্ন : হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মৃত্যু দিবসকে বাদ দিয়ে হুসাইনের মৃত্যুকে বেছে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি শুরু করা হলো কেন?

সপ্তম প্রশ্ন : সর্বোপরি সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে– নবী (ﷺ)-এর অন্য নাতনি ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহা)'র সন্তান এবং হুসাইনের বড় ভাই হাসানের মৃত্যুতে তারা মাতম করে না কেন? তিনি কি হুসাইনের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন?

এবার আসুন, আমরা কারবালার ঘটনা ও হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র শাহাদাতের ঘটনায় বাংলাভাষী সুন্নী মুসলিমদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

১) বিষাদসিন্ধুর কাল্পনিক ও মিথ্যা কাহিনী : বাংলাভাষী মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ মীর মোশাররফ হুসাইন রচিত বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসটি পড়ে থাকেন। কারবালায় হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) নিহত হওয়ার ঘটনাকে বিষয় বস্তু করে এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। এতে ইমাম হুসাইনের ফযীলাতে অসংখ্য বানোয়াট কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। অপরপক্ষে ইয়াযীদকে এমন এমন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যার সঠিক কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বইটি বাংলাভাষী মুসলিমগণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাঠ করে থাকেন। পরিতাপের বিষয় হলো আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাসের বাংলা সাহিত্য বইয়েও প্রবন্ধ আকারে বিষাদ সিন্ধু থেকে নির্বাচন করে বেশ কিছু বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সব পড়ে ও শুনে মুসলিম ছাত্রগণ কারবালার ঘটনা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে গড়ে উঠছে। দাখিল দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাদের বাংলা সাহিত্য বইয়ে হায়রে অর্থ নামে একটি প্রবন্ধ ছিল। এই প্রবন্ধে ইয়াযীদকে যে সমস্ত দোষে দোষারোপ করা হয়েছে, তা পাঠ করে বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। কারণ এগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সাহিত্যিক মান দিয়ে লেখা হয়েছে, যা খুবই আকর্ষণীয়।

এসব প্রবন্ধ ও কাহিনী কারবালার ব্যাপারে সুন্নী মুসলিমদের ভিতরে ভুল ধারণা প্রবেশের অন্যতম একটি কারণ।

২) দেশের সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মিয় দলের কর্মসূচী : আমাদের দেশে রাষ্ট্রিয়ভাবে এবং বিভিন্ন সংঘঠন ও সংস্থার লোকেরা আশুরার দিন হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) কারবালায় শহীদ হওয়ার কারণে এই দিনটি মুসলিমদের নিকট পবিত্র বলে আখ্যা দেয়া এবং জনগণের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচারণা চালানো।

মুহার্‌রম ও আশুরা উপলক্ষে আমাদের দেশের সকল সরকারই তার নিয়ন্ত্রিত রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে বিশেষ কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এই দিন সরকারী ছুটি থাকে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীদের বাণীও প্রচার করা হয়। ইয়াজীদের প্রতি দোষারোপ ও হুসাইনের প্রশংসাই থাকে এগুলোর মূল বিষয়। আরও উল্লেখ করা হয় যে, কারবালায় মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে স্বৈরাচারী ও পৈশাচিক নরপশুর হাতে রাসূলের পবিত্র দৌহিত্র হুসাইনের শাহাদতকে কেন্দ্র করেই এ দিনটি মুসলিম উম্মার নিকট একটি পবিত্র দিন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং তাদের ভাষায় এটি একটি ধর্মীয় পবিত্র দিন। তারা এ কথাটি একবারের জন্যও উচ্চারণ করে না যে, আশুরার দিনটি ইসলাম আসার অনেক আগে থেকেই ফযীলাতপূর্ণ ও পবিত্র। আল্লাহর নবী মূসা (আলায়হিস্ সালাম) এই দিনে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ রোযা রেখেছেন। পরবর্তীতে আমাদের নবী (ﷺ)-ও এর উপর জোর দিয়েছেন।

তারা এটি জানে না যে, ইমাম হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) শহীদ হয়েছেন ৬১ হিজরির মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে আর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইন্তেকাল করেছেন ১১ হিজরি সালে। রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে ওয়াহী আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ওয়াহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ৫০ বছর পর যে ঘটনা

সংঘটিত হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যে দিন সেই ঘটনা ঘটেছে সেই দিনও পবিত্র হতে পারে না। কুরআন ও সহীহ হাদীস যে সমস্ত স্থান ও সময়কে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে, তা ব্যতীত কোনো দিন ও সময় পবিত্র হতে পারে না। মোটকথা সরকারী ও বেসরকারীভাবে দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালন করার কারণে কারবালার ঘটনা ও ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশের মুসলিমগণ বিভ্রান্তিতে পড়েছে।

৩) শিয়া-রাফেযীদের প্রচারণা : আমাদের দেশে শিয়াদের সংখ্যা একেবারে কম হলেও ইসলামের লেবাস পড়ে তারা আশুরার দিন তাজিয়া মিছিল, মার্সিয়া এবং আরও অনেক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তারা প্রতি বছর এই দিনে ঢাকা শহরে প্রকাশ্যেই হুসাইনের প্রতীকি লাশ বহন করে শোক মিছিল করে, শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে। শরীরে রক্তের মতো লাল রং লাগিয়ে হায় হুসাইন! হায় হুসাইন! করে চিৎকার করে এবং বুক ও গালে চপেটাঘাত করে। হুসাইনের প্রতি তাদের এই আবেগ ও কল্পিত ভালোবাসা দেখে সরল মনা ও নবী পরিবারের প্রেমিক সুন্নী-মুসলিমগণ প্রভাবিত হয়ে তাদের বর্ণনা বিশ্বাস করে থাকে। যার কারণে আমাদের দেশের সুন্নী-মুসলিমগণ শিয়াদের প্রতিবাদে কোনো কথা শুনতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। আসলে এটি যে, মাছের মায়ের পুত্র শোকের মতো তা বুঝার মতো পর্যাপ্ত দ্বীনি জ্ঞান ও সঠিক ইতিহাস তাদের জানা নেই।

৪) দাপটের সাথে পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়ার প্রচার : আমাদের দেশের সকল জাতীয় পত্রিকা, আঞ্চলিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন এবং সকল প্রকার বেসরকারী ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া কারবালার ঘটনাটি অন্যের অন্ধ অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। প্রতি বছর মুহার্‌রম মাস আসার সাথে সাথেই প্রতিদিন পত্রিকাগুলোতে এ উপলক্ষ্যে বিশেষ কলাম দেয়া হয়। এগুলো পড়ে সুন্নী মুসলিমগণ আবেগে আপ্লুত হয়ে পত্রিকাগুলোতে যা লেখা হয় তাই বিশ্বাস করেন। অপরপক্ষে মূল সত্যটি কমই প্রকাশ করা হয়। অনেকের জানা থাকলেও শ্রোতের বিপরীতে নৌকা চালাতে তারা সাহসিকতা প্রদর্শন করতে চান না। এ কারণেও সুন্নী-মুসলিমগণ যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

৫) সুফী ও পীরদের ভূমিকা : আমাদের দেশের মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ সুফীবাদ ও পীর-মুরীদিবাদে বিশ্বাসী। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এ সকল পীরদের তরীকা ও সিলসিলা কোনো এক পর্যায়ে শিয়া-ইমামদের কারও না কারও সাথে মিলে যায়। সুতরাং পীরেরা এক দিকে যেমন ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে মুরীদ বানিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে অপরপক্ষে তারা সুন্নী লেবাস পড়ে অনেক ক্ষেত্রে শিয়া মাযহাবের ‘আক্বীদাই প্রচার করে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের দ্বারা মুহার্‌রম, কারবালা ও ইমাম হুসাইনের শাহাদাত নিয়ে সুন্নী-মুসলিমদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তার প্রতিবাদের আশা করা আদৌ সম্ভব নয়।

৬) ইরানী মিডিয়ার ভূমিকা : বাংলাদেশে বহু আগে থেকেই কিছু শিয়া নাগরিক রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান বিশ্বব্যাপি শিয়া মতবাদ প্রচারের যে এজেন্ডা হাতে নিয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ইরানী মিশনারী তৎপর হয়ে উঠেছে। ইরানী দূতাবাস বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে, মুসলিম ছাত্রদেরকে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়ার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সুন্নী মুসলিমদেরকে শিয়া মতবাদের দিকে টেনে নিচ্ছে। প্রতি বছর যখন মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখ আসে, এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান করে থাকে। এতে দেশের উচ্চ পর্যায়ের কিছু বিদআতী আলেম ও শিক্ষাবিদদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। এসব অনুষ্ঠানে সুকৌশলে এমন বক্তব্য আদায় করা হয়, যা সুন্নী মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং তাদেরকে ইরানী ও শিয়া গোষ্ঠির প্রতি দুর্বল করে ফেলে।

৭) হাসান ও হুসাইনের ফযীলাতে বর্ণিত হাদীসসমূহ পড়ে অতি আবেগী হওয়া : আহলে বাইত এবং রাসূল (ﷺ)-এর সকল সাহাবীকে ভালোবাসা আহলে সুন্নাত ও ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদার অন্যতম অংশ। হাসান ও হুসাইন যেহেতু রাসূল (ﷺ)-এর সম্মানিত কন্যা ফাতিমার সন্তান এবং তাদের ফযীলাতে বেশ কিছু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাই প্রতিটি মুসলিমের

উচিত তাদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। তাই আমরা হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসি। তাদের ফযীলাতে যে সমস্ত সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে–

ক) বারা ইবনু ‘আযিব (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

رأيت النبي (ﷺ) والحسن بن علي على عاتقه يقول اللّٰهُمَّ إني أحبه فأحب وأحب من يحبه.

আমি রাসূল (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি হাসান ইবনু ‘আলীকে কাঁধে নিয়ে বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাঁকে ভালোবাসো এবং যে তাঁকে ভালোবাসে তুমি তাকেও ভালোবাসো।[৩০]

খ) রাসূল (ﷺ) আরও বলেন :

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

হাসান ও হুসাইন জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার হবেন।[৩১]

গ) আনাস ইবনু মালিক (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বলেন : হুসাইনের মাথা উবাইদুল্লাহ’র কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সে তাঁর মাথাকে একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করছিল এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে সম্ভবত বেখেয়ালে কিছুটা বর্ণনাও করে ফেলেছিল। হাদীসের শেষের দিকে আনাস (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বলেন : হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) ছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩২]

ঘ) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, এরা দু’জন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দু’টি ফুল।[৩৩]

তাদের ফযীলাতে এমনি আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ﷺ) তাদের প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম এ সমস্ত হাদীস পড়ে বা শুনে এবং সেই সাথে কারবালা নিয়ে অনেক লেখকের কাল্পনিক ও মিথ্যা কাহিনী পড়ে আবেগময়ী হয়ে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়া কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই বলে রাসূল (ﷺ)-এর আদরের নাতি ও ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)’র পুত্র হওয়ার কারণে অতি আবেগী হয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করা এবং মু‘আবীয়াহ্ (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বা অন্য কোনো সাহাবীর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করা বা গালি দেয়া যাবে না।

মুসলিমগণকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, রাসূলের অন্যান্য সাহাবীদের ফযীলাতেও অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও তাদের ফযীলাতে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। সুতরাং সকল সাহাবীকেই ভালোবাসতে হবে। কারও ব্যাপারে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা চলবে না।

ইয়াযীদের ব্যাপারেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণ যে মূলনীতি বেঁধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাওয়া যাবে না। তাদের কথা হচ্ছে– তার উপর লানত বর্ষণ করা এবং তাকে গালি দেয়া যাবে না। এমনিভাবে হাসান ও হুসাইন এবং আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসায় কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যেমনটি করে থাকে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা এবং রাসূল (ﷺ) দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত ৭টি কারণ ছাড়া আরও অনেক কারণে আমাদের বাংলাদেশী সুন্নী-মুসলিমদের মাঝে কারবালার ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীনের সঠিক শিক্ষার বিস্তার হলে এবং ইসলামের ইতিহাসের সঠিক তথ্য তুলে ধরে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হলে অচিরেই সুন্নী মুসলিমগণের ভুল ধারণা পাল্টে যাবে ইন্শা-আল্লাহ। যোগ্য আলেম ও দাঈ‘দের এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখা উচিত।

সর্বোপরি ইসলামে কারও জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করার এবং কারও মৃত্যুতে মাতম করা, উচ্চঃস্বরে বিলাপ করা এবং অন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করার কোনো ভিত্তি নেই। শুধু তাই নয়; এটি একটি জঘন্য বিদআত, যা পরিত্যাগ করা জরুরি। নবী (ﷺ) বা তাঁর সাহাবীগণ কারও জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করেননি। ❑

---

[৩০] *সহীহুল বুখারী।*

[৩১] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন; দেখুন : সিলসিলায়ে সহীহাহ্- হা. ৭৯৬।*

[৩২] *সহীহুল বুখারী।*

[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৯৪।*

সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মূল : ড. শাইখ সালিহ ফাউযান আল ফাউযান

অনুবাদক : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা 'আক্বীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না; বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি মহান আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে।

ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।" হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

"সবর হলো জ্যোতি।"[৩৪]

☆ 'উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, "সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।"[৩৫]

☆ 'আলী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, "ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হলো দেহের মধ্যে মাথার মতো।" এরপর আওয়াজ উঁচু করে বললেন : "যার ধৈর্য নেই তার ঈমান নেই।"

☆ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«وَمَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

"আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেননি।"[৩৬]

সবরের প্রকারভেদ : সবর তিন প্রকার। যথা-

১) মহান আল্লাহর আদেশের উপর সবর করা।
২) মহান আল্লাহর নিষেধের উপর সবর করা।
৩) বিপদাপদে সবর করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।"[৩৭]

'আলক্বামাহ্ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা 'যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন', সে হলো ঐ ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।"

অন্য মুফাস্‌সিরগণ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি বিপদে পড়লে বিশ্বাস রাখে যে, এটা আল্লাহর ফয়সালা মোতাবেক এসেছে। ফলে সে সবর করার পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং মহান আল্লাহর ফয়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর দুনিয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তার অন্তরে হিদায়াত এবং সত্যিকার মজবুত ইয়াকীন দান করেন। যা নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।"

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে হিদায়াত দেন।" এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ- সে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হলে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' অর্থাৎ- আমরা মহান আল্লাহর জন্যই আর তাঁর নিকটই ফিরে যাব।[৩৮]

উক্ত আয়াত প্রমাণিত হয় যে, 'আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রমাণ করে যে, ধৈর্য ধরলে অন্তরের হিদায়াত অর্জিত হয়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন

☆ প্রতিটি পদক্ষেপে মু'মিনের ধৈর্যের প্রয়োজন। মহান আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। মহান আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ এ পথে নামলে নানা ধরণের কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

---

[৩৪] মুসনাদ আহমদ- হা. ২২৯০২ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১/২২৩।

[৩৫] সহীহুল বুখারী।

[৩৬] সুনান আবূ দাঊদ- অনুচ্ছেদ : নিষ্কলুষ থাকা, হা. ১৬৪৪, সহীহ।

[৩৭] সূরা আত্ তাগা-বুন : ১১।

[৩৮] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৬।

عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞ ...وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾

“তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো হিকমত এবং ভালো কথার মাধ্যমে। আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। তোমার প্রভু তো সবচেয়ে বেশি জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথে গেছে আর তিনিই সব চেয়ে বেশি জানেন কারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।... আর ধৈর্য্য ধরো। তোমরা তো ধৈর্য্য ধরো কেবল আল্লাহর উপর।”[৩৯]

☆ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে গেলেও চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। কারণ এ পথে মানুষের পক্ষ থেকে নানা ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা লুক্বমান সম্পর্কে বলেন, (তিনি তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন) :

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾

“হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা করো, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করো। আর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা তো কঠিন সংকল্পের ব্যাপার।”[৪০]

☆ মু’মিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে। সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে তা হালকাভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে। কারণ, সে মহান আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে তকদীরকে বিশ্বাস করে। তকদীরকে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি।

তাকদীরের উপর ঈমান রাখলে তার অনেক সুফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হলো, বিপদে ধৈর্য ধারণ। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বিপদে সবর না করলে তার অর্থ হলো, তার কাছে ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিটি অনুপস্থিত। অথবা থাকলেও তা খুব নড়বড়ে। ফলে সে বিপদ মুহূর্তে রাগে-ক্ষোভে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ রাসূল (ﷺ) খবর দিয়েছেন যে, এটা এমন এক কুফ্‌রী কাজ যা ‘আক্বীদার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

বিপদ-আপদের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মোচন হয়

আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দেন এক মহান উদ্দেশ্যে। তা হলো– এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বান্দার গুনাহ মোচন করে থাকেন। যেমন- আনাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন :

«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِيْ الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গুনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।”[৪১]

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, বিপদ-মুসিবত হলো নিয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে মহান আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্ণা দিতে হয়। মহান আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়। বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায়– তবে এটা তো বিশাল এক নিয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মুসিবত মহান আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে আগের চেয়ে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে, তবে তা দীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ

---

[৩৯] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ১২৫-১২৭।*

[৪০] *সূরা লুক্বমান : ১৭।*

[৪১] *সুনান আত্ তিরমিযী- মা. শা., হা. ২৩৯৬, হাসান সহীহ।*

আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেক্বী, ধৈর্য্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফ্‌রী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফর্‌য কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। মুসিবতের কারণে নয়; বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর।

পক্ষান্তরে বিপদ-মুসিবত যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে, তবে এই মুসিবত তার জন্য দীনের ক্ষেত্রে বিশাল নিয়ামতে পরিণত হয়।

বিপদ-আপদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেন

বিপদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেন কে ধৈর্য্যের পরিচয় দেয় এবং মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে কে ধৈর্য্যহীনতার পরিচয় দেয় ও মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যেমন- নাবী (ﷺ) বলেন :

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ».

"নিশ্চয়ই বিপদ যত কঠিন হয় পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান।"[৪২]

অত্র হাদীসে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যেমন-

১) বান্দা যেমন 'আমল করবে তেমনই প্রতিদান পাবে। "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

২) এখানে মহান আল্লাহর একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হলো– 'সন্তুষ্ট হওয়া'। আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণের মতই এটি একটি গুণ। অন্য সব গুণের মতই এটিও মহান আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে যেমনটি তার জন্য উপযুক্ত হয়।

৩) অত্র হাদীসে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা এক বিশাল উদ্দেশ্যে বান্দার উপর বিপদ-মুসিবত দিয়ে থাকেন। তা হলো– তিনি এর মাধ্যমে তার প্রিয়পাত্রদেরকে পরীক্ষা করেন।

৪) এখানে তকদীরের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫) মানব জীবনে যত বিপদাপদই আসুক না কেন সব আসে মহান আল্লাহর দেয়া তকদীর তথা পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালা অনুযায়ী।

৬) এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ নেমে আসলে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বিপদের মুখে আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে এবং তার উপরই ভরসা রেখে পথ চলতে হবে।

ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়

জীবনের সকল কষ্ট ও বিপদাপদে আল্লাহ তা'আলা নামায ও সবরের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। অর্থাৎ- তাদেরকে তিনি সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য অনুসন্ধান করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন।"[৪৩]

এখান থেকে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মু'মিন ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি পদে পদে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া দরকার। এই সবরের মাধ্যমে 'আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৪২] *সুনান আত্ তিরমিযী- মা. শা., ৪/৬০১।*

[৪৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৩।*

সূচীপত্র

কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

–মুহাম্মদ সাব্বির বিন জাব্বির*

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শাখায় ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে সেটা হলো– "ইতিহাস"। হোক সেটা মুসলিমদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বা অমুসলিমদের ইতিহাস-ঐতিহ্য। খোলাফায়ে রাশেদাগণের পরে আসা ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা "'উমাইয়াহ্ খিলাফত"-এর ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিহাসের পাতায় কলুষিত করা হয়েছে 'উমাইয়াহ্ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও। মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা থেকে মুক্তি পায়নি 'উমাইয়াহ্ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। বিখ্যাত মিশরীয় ইতিহাসবিদ মাহমুদ শাকের (১৯২৬-১৯৮০) (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"বেশ কিছু দিক থেকে 'উমাইয়াহ্ খিলাফতের ইতিহাস বিকৃতির শিকার হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– **(ক)** 'আব্বাসীদের পক্ষ থেকে– যেহেতু তাদের যুগে ইতিহাস সংকলন করা হয়েছিল। **(খ)** শিয়া ও খারেজিরাও এই খিলাফতের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। **(গ)** কিছু আবেগপ্রবণ মুসলিমের মাধ্যমেও এর বিকৃতি ঘটেছে।

'উমাইয়াহ্ খিলাফতকালে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটেছে যা ইতিহাসের পাতায় ব্যাপক চর্চিত, আলোচিত ও সমালোচিত। এগুলোর অন্যতম একটি হলো– "কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র শহীদ হওয়া"। এ ঘটনাকে অনেক লেখক ও গবেষক তাদের লেখা ও গবেষণাকর্মে স্থান দিয়েছেন ও উপস্থাপন করেছেন। যেগুলোর অনেক কিছুতেই বানোয়াট ও মিথ্যা রয়েছে। বিশেষকরে– বাংলা ভাষায় রচিত আর্টিকেল ও বইয়ে ভরপুর বানোয়াট কথা আছে। বঙ্গীয় লেখক মীর মোশাররফ হোসেন কর্তৃক রচিত "বিষাদ সিন্ধু" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাতে বহু মিথ্যা ও বানোয়াট কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে বিখ্যাত ইমাম ইতিহাসবিদ আবুল ফিদা হাফিয ইবনু কাসির আদ্ দামেশ্‌কী (রাহিমাহুল্লা-হ) (৭০১-৭৭৪) কর্তৃক রচিত "আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া", বরেণ্য ঐতিহাসিক ইমাম মোহাম্মদ ইবনু জারির আত্ তাবারি (রাহিমাহুল্লা-হ) (২২৪-৩১০)'র ইতিহাস গ্রন্থ এবং মিশরীয় ইতিহাসবিদ মাহমুদ শাকের (১৯২৬-১৯৮০) কর্তৃক রচিত "আদ্ দাওলা আল উমাবিয়াহ্"-সহ বিশুদ্ধ সূত্রগুলো সামনে রেখে উক্ত বিষয়ে আলোচনা বেগবান করার চেষ্টা করব বি-ইজনিল্লাহ।

"৬০ হিজরির কথা। 'উমাইয়াহ্ খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) তাঁর নিজ পুত্র ইয়াজিদের কাছে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীপুত্র সাহাবী তার হাতে বাইয়াত করেননি। তাদের অন্যতম হলেন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৌহিত্র, জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত চতুর্থ খলিফা 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) ও নবীজি (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা)'র পুত্র-হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)। এরপর কুফা থেকে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র নিকট একের পর এক চিঠি আসতে লাগলো। কুফাবাসি হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে এ মর্মে অবগত করল যে, তারা খলিফা হিসেবে তাঁকে চায়, ইয়াজিদকে নয়। সমর্থন-চিঠি পেয়ে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকিলকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কুফায় প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে মুসলিম দেখতে পেলেন, তারা হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে চায়। তিনি হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে সেটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েও দিলেন। কিছু লোক হানি ইবনু 'উরওয়ার ঘরে মুসলিমের হাতে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র পক্ষে বাইয়াত নেওয়া শুরু করল। ইয়াজিদ এ কথা জেনে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে সেখানে প্রেরণ করেন এবং ইয়াজিদ এ আদেশ দিলেন যে, কুফাবাসী যেন হুসাইনের সাথে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে, তবে তিনি কাউকে হত্যা করার আদেশ করেননি।" বিশুদ্ধ উৎসগুলো যা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে, এর আলোচনা সামনে আসছে।

একদা মুসলিম ইবনু আকিল চার হাজার সমর্থক নিয়ে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের প্রাসাদ দ্বিপ্রহরে ঘেরাও করলেন। উবায়দুল্লাহ তাদের সামনে একটি জোরালো ভাষণ দিলেন। তাদেরকে ইয়াজিদের শাস্তির ভয় দেখালে, শেষ পর্যন্ত কেউ আর মুসলিম ইবনু আকিলের সাথে থাকলো না। তাঁকে ছেড়ে সবাই চলে গেল। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হলো এবং হত্যা করার আদেশ দিলো উবায়দুল্লাহ। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)'র সমীপে একটি চিঠি লিখে যান, যার সারসংক্ষেপ হলো–

---

* *শিক্ষার্থী, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

সূচীপত্র

“হুসাইন! পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফাবাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলেনি।”

অন্যদিকে মক্কা থেকে যুলহিজ্জার ৮ তারিখে হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) কুফার দিকে রওনা দেন। তাকে অনেক সাহাবী আকুতি-মিনতি করে এ সফরে রওনা দিতে নিষেধ করেছিলেন। যারা তাঁকে বারণ করেছিলেন তাঁরা হলেন : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র এবং তাঁর ভাই মোহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ্।

সুফ্‌ইয়ান আস সাওরী ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, “ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হুসাইনকে বলেছিলেন : মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমার ঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম।”

‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হুসাইনকে বলেন : হুসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে যাচ্ছো, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকে আঘাত করেছে?

তবু তিনি বের হয়ে গেলেন –এটা ছিল তাঁর ইজতেহাদ। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান পতিথযশা আলেম। শরিয়তের বিবেচনায় তাঁর ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু’টি পুরস্কার। আর কোনো বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।[৪৪]

মুসলিম ইবনু আকিলের চিঠি যাত্রা পথে হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র নিকট পৌঁছলে, তিনি কুফায় গমন পরিহার করেন। ইয়াজীদের নিকট সিরিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইয়াজিদের সৈন্যরা ‘আম্‌র ইবনু সা’দ, সাম্মার ইবনু যিল-জাওশান ও ‘উমার ইবনু তামির নেতৃত্বে হুসাইন ও তার সাথীদের গতি থামিয়ে দেয়। এ অবস্থায় তিনি তাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো– **(ক)** তাকে ইয়াজিদের নিকট যেতে দেওয়া হোক। **(খ)** অথবা মদিনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক। **(গ)** তিনি ইসলামী ভূখণ্ডের সীমানায় যেতে চান এবং সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করে ইসলামী সম্রাজ্য বিস্তার করবেন বলে তাদেরকে জানান। কিন্তু তারা প্রস্তাবগুলো একটাও গ্রহণ করল না; বরং উবায়দুল্লাহ’র সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকলো।

একদা সাহাবী ও তাবিদের দ্বারা গঠিত ছোট্ট দলটি হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু করলেন। মুসলিমদের মাঝে এবং তাদের মাঝে সৈন্যের সংখ্যার দিক থেকে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। এক পর্যায়ে হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) ছাড়া সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। পরিশেষে, সাম্মার ইবনু যিল জাওশান রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৌহিত্র চতুর্থ খলিফা ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) ও জান্নাতি নারীদের সরদারনি ফাতিমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহা)’র পুত্র হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল। তার আঘাতে তিনি দুনিয়ার জীবন ছেড়ে রবের দরবারে ১০ মুহার্‌রম ৬১ হিজরিতে পাড়ি জমান। তিনি শহীদদের তালিকায় নাম লিখান।

এটি মুসলিমদের ইতিহাসের একটি লজ্জাজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা –যা আমাদের হৃদয়কে প্রাণনাশ অবধি যন্ত্রণা দেবে। এটি কারবালার প্রকৃত ইতিহাস, যা ইরাকের শিয়ারা রং মিশিয়ে ঘোলাটে করার চেষ্টা করেছে এবং উম্মাহকে মিথ্যা বার্তা দিয়েছে।

হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র প্রকৃত হত্যাকারী : হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র প্রকৃত হত্যাকারী সম্পর্কে ঘোলাটে ইতিহাস রচিত হয়েছে পরতে পরতে। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত নিচে উল্লেখ করা হলো–

(ক) বরেণ্য অবিসংবাদিত ইমাম শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, “সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমতে ইয়াজিদ ইবনু মু‘আবিয়াহ্ হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হত্যার আদেশ দেয়নি; বরং উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে ইরাকে হুসাইনকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিতে বলেছিল। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। বিশুদ্ধ মতে তার কাছে যখন হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে সে আফসোস করেছিল। সে হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র পরিবারের কোনো মহিলাকে বন্দী বা দাসীতে পরিণত করেনি; বরং পরিবারের জীবিত সকল সদস্যকে সসম্মানে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল।”

(খ) মিশরীয় ইতিহাসবিদ মাহমুদ শাকের (১৯২৬-১৯৮০) বলেন– “অনেকেই বলে থাকে ইয়াজিদ হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র হত্যার খবর শুনে আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো– তিনি আনন্দিত হওয়া তো দূরের কথা; বরং খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। সাম্মার এবং উবায়দুল্লাহ’কে তিনি অভিসম্পাদ করেছেন। তিনি বলেছিলেন– আমি যদি ইবনু ইয়াজিদের স্থলে থাকতাম

---

[৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৫২।*

সূচীপত্র

তাহলে হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ক্ষমা করে দিতাম। অতঃপর পরিবারের মহিলাদেরকে নিজের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তিনদিন পর্যন্ত কান্নাকাটি করেছিলেন। পরিশেষে, তিনি হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র পরিবারকে নিরাপত্তার সাথে মদিনায় পাঠিয়ে দেন।"

(গ) ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : এটা নিশ্চিত যে, ইয়াজিদ যদি হুসাইনকে কাছে পেতেন তাহলে তাকে হত্যা করতেন না, এটা তার পিতা মু'আবিয়াহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র ওয়াসীয়তেরও অংশ ছিল এবং তিনি তা মেনেও নিয়েছিলেন।

অর্থাৎ- ইয়াজীদ হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হত্যা করেনি এবং সে হত্যা করার নির্দেশও প্রদান করেনি। তবে, হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) শাহাদাত হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ'কে সে অপসারণ করেননি। এজন্য কিছু আলেম তাকে একদম নির্দোষ মনে করেন না।

প্রকৃতপক্ষে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে প্রমাণ মেলে যে, হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র হত্যাকারী মূলত ইরাকবাসী অর্থাৎ- শিয়ারা। নিচের উক্তিগুলো বুঝতে আরো সহায়তা প্রদান করবে–

(ক) আশ শিয়ী কাযিম আল ইহসান আন্ নাজফী বলেন– "হোসেন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র বিরুদ্ধে যে দলটি বের হয়েছিল তারা সংখ্যায় তিন হাজার ছিল। আর তাদের প্রত্যেকেই কুফার অধিবাসী ছিল। সেখানে ছিল না কোনো শাম, মক্কা-মদিনা, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, মিশর বা সুদানের কোনো অধিবাসী।"

(খ) সাইয়্যেদ মহসিন আল আমিন বলেন– বিশ হাজার ইরাকবাসী হুসাইনের পক্ষে বাইয়াত নেয়। অতঃপর তারা তাঁর থেকে সরে যায়, ওয়াদা ভঙ্গ করে, বিদ্রোহ করে ও তাকে হত্যা করে।

(গ) ইবনু আবূ নু'আয়ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ইবনু 'উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একটি লোক মশার রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন : কোন দেশের লোক তুমি? সে বললো : আমি ইরাকের বাসিন্দা। ইবনু 'উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, তোমরা এর দিকে তাকাও, সে আমাকে মশার রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, অথচ তারা নবী (ﷺ)-এর সন্তানকে হত্যা করেছে। আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– ওরা দু'জন (অর্থাৎ- হাসান ও হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।"

(ঘ) হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র সর্বশেষ কথা থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শহীদ হওয়ার ক্ষেত্রে ইয়াজিদের কোনো নির্দেশ ছিল না।

মোদ্দাকথা– হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র হত্যাকারী ইরাকবাসী অর্থাৎ- শিয়ারা, ইয়াজিদ নয় –যা শক্তিশালী দলিলের আলোকে প্রমাণিত হয়। তবে, সে একদম নির্দোষও নয়।

এক্ষেত্রে **আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান :**

(ক) জগৎ বিখ্যাত বরেণ্য ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন– "হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র শাহাদাতের ব্যাপারে ইয়াজিদকে অনেকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে লানত করে থাকে। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অর্থাৎ- হক্বপন্থী আলেমদের অবস্থান হলো– তাঁরা এ ঘটনায় মর্মবেদনা প্রকাশ করে থাকে, ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর কাছে উপর্যুক্ত বিষয়টি ন্যস্ত করে থাকে।"

(খ) সালেহ ইবনু আহমদ, তার পিতা আহমদ ইবনু হাম্বলকে বলেন, এক দল লোক ইয়াজিদকে মুহাব্বত করে। আহমদ ইবনু হাম্বল বলেন, কোনো মু'মিন কি তাকে মুহাব্বত করতে পারে? তখন ছেলে বলে, তাহলে আপনি তাকে লানত করেন না কেন? আহমদ ইবনু হাম্বল বলেন, তুমি তোমার পিতাকে কখনো কাউকে লানত করতে দেখেছ? অর্থাৎ- আমরা ইয়াজিদকে দোষী সাব্যস্ত করবো না এবং তাকে ভালোবাসবোও না। যেমনটি বরেণ্য ইমাম যাহাবি (রাহিমাহুল্লা-হ) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম যাহাবী বলেন– "আমরা তাকে গালিও দিব না এবং তাকে ভালোবাসবোও না।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) একই কথা বলেছেন : "আমরা এজিদকে ভালোবাসার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করব না ও লানতের মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করবো না।"

কেননা, মুসলিমকে গালি দেয়া বা লানতের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেন : কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরি।[৪৫]

মুসলিমদের একটি কথা জেনে রাখা দরকার– রাসূল (ﷺ) কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাতকে অবধারিত করে ফেলল। উম্মে হারাম (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি রোমকদের রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তিনি বললেন, আমি কি তাদের মধ্যে হব? রাসূল (ﷺ) বললেন, না।"[৪৬]

---

[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৪৪।*

[৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯২৪।*

সূচীপত্র

মু‘আবিয়াহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র খিলাফতকালে (৪১-৬০ হি.) ৫২ হিজরি সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়।

ইবনু কাসীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু) অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও যোগদান করেছিলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, আবূ আইয়্যূব আনসারী প্রমুখ খ্যাতনামা সাহাবীগণ।

সুতরাং ইয়াজিদের ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমাদের নিজেদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ কথা আমাদের জেনে রাখা দরকার– এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোক প্রকাশের জন্য কান্নাকাটি করা, গাল চাপড়ানো, বিলাপ ইত্যাদি করা কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় –যা শিয়ারা করে থাকে। এ ব্যাপারে অনেক শরয়ী দলিল বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো–

রাসূল (ﷺ) বলেন : যে গালে থাপ্পড় মারে, পকেট ছিঁড়ে ফেলে ও জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির প্রতি আহ্বান জানায় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৪৭]

তিনি (ﷺ) আরো বলেন– “মাতমকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ্ না করলে কিয়ামত দিবসে তাকে আলকাতরার পাজামা ও খোস-পেঁচড়াযুক্ত বর্ম পরিহিতা অবস্থায় তোলা হবে।”

আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি যে, ইরাকের শিয়ারা হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ১০ মুহার্‌রম ৬১ হিজরিতে শাহাদত করেছে। আর তারাই সাধু সেজে দরদ দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে ও আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। মিশরীয় ইতিহাসবিদ মাহমুদ শাকেরের ভাষায় বলতে হয়– “হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র পিতা, ইসলামের চতুর্থ খলিফা ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো এ নিয়ে কেন তারা কোনো শোক বার্ষিকী পালন করে না? বিশুদ্ধ আলেমদের মতে, তৃতীয় খলিফা ‘উসমান (রযিয়াল্লা-হু আনহু) ‘আলী (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র থেকেও শ্রেষ্ঠ তাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো, এ নিয়ে তো তারা কোনো বেদনা প্রকাশ করে না? ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু), আবূ বক্‌র (রযিয়াল্লা-হু আনহু) কঠিন বিপদের মুখে পড়ে পরপারে পাড়ি জমালেন এ নিয়ে তো তাদের কোনো শোকগাথা নেই? সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী (ﷺ) আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গিয়েছেন, এ নিয়ে তো তারা গাল চাপড়িয়ে কান্নাকাটি করে না? এর নেপথ্যে আসলে কারণ কি? কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের এত শোকবার্তা প্রকাশের কারণ কি? কারণ একটাই– তারাই অর্থাৎ- শিয়ারাই হুসাইন (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে শাহাদাত করেছে। ঐতিহাসিকভাবে তারা এটাকে গোপন করার চেষ্টা করছে।

তারা এই দিন ও মাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্ম করে থাকে –যা ইসলামে বৈধতার লেশমাত্র নেই। মনে রাখতে হবে– মুহার্‌রম মাসের দু’টি দিক রয়েছে– **(ক)** ঐতিহাসিক দিক, **(খ)** ফযীলাতের দিক। এই ফযীলাত নবী (ﷺ) কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে। তাঁর মৃত্যুর পর নতুন করে আর কোনো ফযীলাত আসতে পারে না, কেননা ওয়াহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কেউ এটা অস্বীকার করার হীন প্রয়াস করে, তাহলে তার কাজ ইসলাম পরিপন্থী। মূলত ইসলামের ইতিহাসে মুহার্‌রমের দশম দিন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ মাসের ১০ তারিখে নূহ্ (আলায়হিস্ সালাম) প্লাবনের পর জাহাজ থেকে ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন এবং মূসা (আলায়হিস্ সালাম) ফিরআউন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। মূসা (আলায়হিস্ সালাম) রক্ষায় শুকরিয়াস্বরূপ রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবীগণ সিয়াম পালন করেছেন। এমনটি শরিয়তের বর্ণিত হয়েছে।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, “নবী (ﷺ) মদিনায় এসে দেখতে পেলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। নবী (ﷺ) বললেন, এটি কী? তারা বলল, এটি একটি ভালো দিন। এ দিনে আল্লাহ তা‘আলা বানী ইস্‌রা-ঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মূসা (আলায়হিস্ সালাম) রোযা পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি হক্বদার। অতঃপর তিনি রোযা রেখেছেন এবং সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।”[৪৮]

প্রকৃতপক্ষে আমাদের করণীয় হলো– যালেম শাসক ফিরআউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ মুহার্‌রম দু’টি নফল সিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ মুহার্‌রম একটি সিয়াম পালন করা। এর বেশি কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম-মাযলূম সকলকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৯৪।*

[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৬৫।*

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ০৮ জুলাই- ২০২৪ ঈ. ❖ ০১ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

ক্বাসাসুল হাদীস

মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তার পুরস্কার

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

তাওয়াক্কুল বা মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মু'মিনের অন্যতম গুণও বটে। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনিই বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, বান্দার আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে বানী ইস্‌রা-ঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা নিম্নরূপ–

আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ([illegible]) উল্লেখ করেছেন যে, বানী ইস্‌রা-ঈলের জনৈক ব্যক্তি বানী ইস্‌রা-ঈলের অপর এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দীনার কর্জ চাইল। তখন সে (কর্জদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে আসুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে (ঋণগ্রহীতা) বলল, সাক্ষীর জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। কর্জদাতা বলল : তাহলে আপনি একজন জামিনদার নিয়ে আসুন, সে (ঋণগ্রহীতা) বলল, জামিন হিসেবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের চুক্তিতে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিলো। অতঃপর সে (ঋণগ্রহীতা) সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার (ব্যবসায়িক) প্রয়োজন সমাপ্ত করল। তারপর সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে কর্জদাতার কাছে এসে পৌছতে পারে। কিন্তু কোনোরূপ যানবাহন সে পেল না। তখন (নিরুপায় হয়ে) সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং কর্জদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি আটকিয়ে দিলো। তারপর ঐ কাষ্ঠখণ্ডটি নিয়ে সমুদ্র কুলে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি অমুকের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ চাইলে সে আমার কাছ থেকে জামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, মহান আল্লাহই যথেষ্ট জামিন, এতে সে রাজী হয়ে যায়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসেবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। এতেও সে রাজী হয়ে যায় (এবং আমাকে কর্জ দেয়)। আমি তার প্রাপ্য তার নিকট পৌছে দেয়ার নিয়তে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমার কাছে আমানত রাখছি। এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর ব্যক্তিটি চলে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ঐদিকে কর্জদাতা (নির্ধারিত দিনে) এ উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা দেনাদার তার পাওনা টাকা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটি তার নজরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরোটি চিরলো তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটি সে পেয়ে গেল। কিছুকাল পর দেনাদার ব্যক্তিটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে (পাওনাদারের কাছে) এসে হাযির হলো (কারণ কাঠের টুকরোটি পৌছা তো সম্ভবপর ছিল না) এবং (সময় মতো কর্জ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে) বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার কর্জ (প্রাপ্য) যথা সময়ে পৌছে দেয়ার নিয়তে যানবাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু যে জাহাজে করে আমি এখন এসেছি এর আগে আর কোনো জাহাজই পেলাম না (তাই সময় মতো আসতে পারলাম না)। কর্জদাতা বলল, আপনি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বলল, আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর পূর্বে আর কোনো জাহাজই আমি পাইনি। সে (কর্জদাতা) বলল, আপনি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলা আপনার হয়ে আমাকে পৌছিয়ে দিয়েছেন। অতএব আপনি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে খুশি মনে ফিরে যান।[৪৯]

শিক্ষা : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, সে অকল্পনীয়ভাবে তার মর্যাদা লাভ করবে, তার ফলাফল ভোগ করবে। ❑

---

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২২৯১, ই. ফা. বাং, অনুচ্ছেদ : ১৪২৫ শেষাংশ, আ. প্র., কিতাবুল কিফালাহ, অনুচ্ছেদ : ১।*

সূচীপত্র

বিশেষ মাসায়িল

মসজিদের মাইকে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার হুকুম কি?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : ইসলামে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার একাধিক অবস্থা রয়েছে।

১) যে ঘোষণাটা জাহেলি যুগের প্রচারণার মতো হয়, সেটা হারাম। যেমন- তারা গণজমায়েতের স্থানগুলোতে, বাজারে এবং ঘরের দোয়ারে দোয়ারে গিয়ে মৃতব্যক্তির বংশীয়-গৌরব ও কীর্তিগুলো উল্লেখ করে বিলাপ, আর্তনাদ ও হাহুতাশ প্রকাশ করতো। এ জন্যই অধিকাংশ আলেমের মতে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার মধ্যে যদি জাহেলী যামানার মতো আওয়াজ উঁচু করা হয় এবং তাতে জাহেলী যামানার অভ্যাস থাকে, তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে।

২) বংশীয়-গৌরবগাঁথা কিংবা কীর্তি উল্লেখ না করে উচ্চস্বরে মানুষকে শুধু জানানোর জন্য এবং সংবাদটি প্রসিদ্ধ করার জন্য মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা। এটাও মাকরূহ বা নিষিদ্ধ।

৩) জাহেলী সমাজের কোনো রীতি-নীতি ছাড়া বেশি সংখ্যক মুসাল্লী হাজির করার জন্য শুধু মৃত্যু সংবাদটা জানানো।

হাদীস দ্বারা শেষ প্রকারের শোক সংবাদ প্রচার করার বৈধতা পাওয়া যায়। যেমন- (ﷺ) নাজ্জাশী, মুতার যুদ্ধের শহীদ জাফর বিন আবূ ত্বালিব, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা এবং অন্যান্য সাহাবীর মৃত্যু সংবাদ মসজিদের ভিতরে এবং মিম্বারের উপর ঘোষণা করেছেন।

হানাফীদের মতে বংশীয় মর্যাদা ও কৃতিত্ব উল্লেখ করা ব্যতীত বাজারে এবং গণজমায়েতের স্থানে আওয়াজ উঁচু করে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা মাকরূহ নয়। তারা বলেন, এতে বেশি সংখ্যক মুসাল্লী এবং মাইয়্যিতের জন্য বেশি সংখ্যক ক্ষমা প্রার্থনাকারী উপস্থিত হয়। এটা জাহেলী যামানার নাঈ তথা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের মতো নয়। তারা গোত্রে গোত্রে লোক পাঠিয়ে শোরগোল করে, চিৎকার করে, বিলাপ করে এবং মৃতের কৃতিত্ব গণনা করে এবং বংশীয় মর্যাদা বর্ণনা করে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করতো।

যারা মৃত্যু প্রচারে আওয়াজ উঁচু করার ঘোর বিরোধী, তারা এর জবাবে বলেছেন যে, আওয়াজ করার মাধ্যমে ঘোষণা না করেও বেশি সংখ্যক মুসাল্লী একত্রিত করা সম্ভব। সেই সঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, উঁচু আওয়াজে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জাহেলীয়াতের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সাদৃশ্য রয়েছে, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।[৫০]

ইমাম কাসানি বলেন : মৃতব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে জানাতে কোনো আপত্তি নেই; যাতে করে তারা জানাযার নামায পড়া, দু‘আ করা ও কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে মৃতব্যক্তির হক্ব আদায় করতে পারে। আর যেহেতু সংবাদ দেয়ার মধ্যে নেকির কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রস্তুতি নেয়ার প্রতি উৎসাহিত করণ রয়েছে। তাই এটি নেকি ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করার মধ্যে পড়বে এবং ভালো কাজের মাধ্যম হওয়া ও সন্ধান দেয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে।[৫১]

স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়ায় (৮/৪০২) এসেছে, কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদেরকে জানানো ও আহ্বান করা জায়িয; যাতে করে তারা জানাযার নামায পড়তে পারে, তার জন্য দু‘আ করতে পারে, তার লাশের সাথে যেতে পারে এবং কাফন-দাফনকর্মে সহযোগিতা করতে পারে। কেননা নাজাশি যখন মারা গিয়েছিল তখন নবী (ﷺ) তাঁর সাথীবর্গকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন যাতে তারা তার জানাযার নামায পড়তে পারে।

[পরবর্তী অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]

---

[৫০] *দেখুন : ফাতহুল কাদীর- ২/৪৮২।*

[৫১] *বাদায়িউস সানায়ি- ৩/২০৭।*

সমাজচিন্তা

অহংকার ও পরিণতি

–আব্দুল্লাহ এম. আহমাদ[★]

অহংকার মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যারা আল্লাহ রাব্বুর ‘আলামীনকে ভয় করে, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একমাত্র ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে, যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত না; বরং প্রবৃত্তিকে মহান আল্লাহর বিধানের কাছে অবদমিত করে, যারা শয়তানের প্ররোচনাকে পদদলিত করে মহান আল্লাহর নির্দেশনায় নিজকে উৎসর্গ করে তারা এই সহজাত প্রবৃত্তি অহংকারকেও পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়।

মূলতঃ অহংকার হচ্ছে শয়তানের ছলনা ও তার অলংকার। সৃষ্টির শুরুতে প্রথমেই অহংকার করেছিল এই শয়তান। শয়তানের সেই অহংকারই সর্বনাশ করে দিয়েছিল তার জীবনের চলারপথ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যেমন বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

“যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সাজদাহ্ করো, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সাজদাহ্ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”[৫২]

মূলতঃ আদমকে সাজদাহ্ করার বিষয়টি ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশ। আদম (আলায়হিস সালাম) ছিলেন মাটির তৈরি, আর ইবলীস ছিল আগুনের তৈরি। ইবলীসের মধ্যে ছিল চরম অহংকার। তাই সে অহংকারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বলেছিল, আমি আগুন থেকে সৃষ্টি, আদমকে তৈরি করা হয়েছে মাটি থেকে। অতএব, কার নির্দেশ সে কথা ভুলে গিয়ে ইবলীসের মনে চরম অহংকার ও উদ্ধত আচরণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিনের নির্দেশকে ভুলে গিয়ে আদম (আলায়হিস সালাম)-কে সাজদাহ্ করা থেকে বিরত থাকে। ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, অহংকারের পাপই ছিল সর্বপ্রথম পাপ যা আদম (আলায়হিস সালাম)-কে সাজদাহ্ করা হতে ইবলীসকে বিরত রেখেছিল।[৫৩]

এই অহংকার, এই কুফ্‌রী, এই অবাধ্যতাই ইবলীসের গণ্ডদেশে অভিসম্পাতের শিকল লাগিয়ে দেয় এবং মহান আল্লাহর রহমাত হতে নিরাশ হয়ে তাঁর দরবার থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

কেন মানুষ অহংকার করে?

মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে নানাবিধ কারণে। কেউবা অহংকারী হয় ধন-সম্পদের কারণে, কেউবা বিদ্যার কারণে, কেউ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কারূনকে দিয়েছিলেন আগাধ সম্পদ ও ধন-ভাণ্ডার। আর কারূন হয়ে পড়ে অহংকারী। সূরা আল ক্বাসাস-এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾

“কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছিল। তাকে আমি এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে, তার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল। স্মরণ করো যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল (ধনের) গর্ব করো না, আল্লাহ গর্বিতদেরকে ভালোবাসেন না।”[৫৪]

তাফসীর ইবনু কাসীরে ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত। কারূন ছিল মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর চাচাতো ভাই।... কারূনের গলার স্বর ছিল খুবই সুমিষ্ট। সে সুমিষ্ট স্বরে তাওরাত পাঠ করত। কিন্তু সামেরী যেমন মুনাফিক্ব ছিল অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর এই শত্রুও মুনাফিক্ব হয়ে গিয়েছিল। সে বড় সম্পদশালী ছিল বলে সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়েছিল এবং মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তার ক্বওমের মধ্যে সাধারণভাবে যে

[★] লেখক, গণমাধ্যম কর্মী ও গবেষক।

[৫২] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৪।

[৫৩] ইবনু আবূ হাতিম- ১/২৩।

[৫৪] সূরা আল ক্বাসাস : ৭৬।

পোষাক প্রচলিত ছিল, সে ওর চেয়ে অর্ধ হাত নিচু করে পোষাক তৈরি করে, যাতে তার অহংকার ও ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়। তার এত বেশি ধন-সম্পদ ছিল যে, তাঁর কোষাগারের চাবিগুলো উঠাবার জন্য শক্তিশালী লোকদের একটি দল নিযুক্ত ছিল।

ইবনু কাসীরে আরো বর্ণিত হয়েছে, তার ক্বওমের সম্মানিত সৎ ও ‘আলেম লোকেরা যখন তার দম্ভ ও ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছাতে দেখলেন, তখন তারা তাকে উপদেশ দিলেন, “এত দাম্ভিকতা প্রকাশ করো না, মহান আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ো না, অন্যথায় তুমি তার কোপানলে পতিত হবে। জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।” তারা তাকে আরো বলতেন, “মহান আল্লাহর দেয়া নিয়ামত যে তোমার নিকট রয়েছে তা দিয়ে তার সন্তুষ্টি অর্জন করো এবং তাঁর পথে তার থেকে কিছু কিছু ব্যয় করো যাতে তুমি আখিরাতের অংশও লাভ করতে পার।”

“... নিজের চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে তুমি মহান আল্লাহর হক্ব ভুলে যেও না। তিনি যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহকারী। জেনে রেখ, তোমার সম্পদে দরিদ্রেরও হক্ব রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হক্বদারের হক্ব তুমি আদায় করতে থাকো। আর তুমি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না...।”

পরবর্তী আয়াতেই কারূনের চরম দাম্ভিকতা ও অহংকারের চিত্র ফুটে ওঠে। কারূন উদ্ধতভাবে বলে ওঠে, তোমরা তোমাদের উপদেশ রেখে দাও। আমি খুব ভালো করেই জানি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যা দিয়েছেন আমি তার যথাযথ হক্বদার। আর আল্লাহ তা‘আলা এটা জানেন বলে আমাকে এসব দান করেছেন। মূলতঃ এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ ধরনের চেতনা কাজ করে। যার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সূরা আয্ যুমার-এ বলেন,

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“মানুষকে বিপদাপদ স্পর্শ করলে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে ধন্য করি তখন সে বলে– আমার জ্ঞান গরিমার বদৌলতেই আমাকে তা দেয়া হয়েছে। না, তা নয়। এটা একটা পরীক্ষা (অনুগ্রহ লাভ করে কে আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয় আর কে নিজের বড়াই প্রকাশ করে তা দেখার জন্য)। কিন্তু (এর গুরুত্ব) তাদের অধিকাংশই বুঝে না।”[৫৫]

কারূনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কারূনের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, তার যোগ্যতা আছে, ক্ষমতা আছে, জ্ঞান আছে বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাকে এত ধন-সম্পত্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্’য় যেমন বলেন,

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾

“দুঃখ-বিপদ মানুষকে স্পর্শ করার পর আমি যখন তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্য অবশ্যই বলে– এটা আমার ন্যায্য পাওনা।”[৫৬]

যেমনটি কারূন মনে করেছিল ঐ ধন-সম্পত্তির হক্বদারই যেন সে।

কারূনের এই অহংকার ও বেঈমানীসুলভ কথা-বার্তা এবং আচরণ কারূনকে আরো বেশি ঔদ্ধত্য প্রকাশে বাধ্য করে। আর এটিই তার অধঃপতন বা চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমনটি সহীহুল বুখারী’তে সালিম (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, একটি লোক তার লুঙ্গি লটকিয়ে অহংকারভাবে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে।” মুসনাদে আহমাদেও আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে একটি লোক দু’টি সবুজ চাদরে নিজেকে আবৃত করে দম্ভভরে চলছিল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা জমিনকে নির্দেশ দিলেন, তাকে গিলে ফেলো।”

---

[৫৫] *সূরা আয্ যুমার : ৪৯।*
[৫৬] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৫০।*

এমনিভাবে পতন ঘটে কারূনেরও। অকস্মাৎ চরম অহংকার, অহমিকা, দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্যতার অবসান ঘটিয়ে কারূনকে চরম ধ্বংসের পরিণতি বরণ করে নিতে হয়। তবে তার পতন কিভাবে হয়েছিল সুস্পষ্টভাবে বিবরণ পাওয়া না গেলেও ঐতিহাসিকগণ ইস্‌রা-ঈলী বর্ণনার আলোকে বিভিন্নভাবে তা বর্ণনা করেছেন।

ধন-সম্পদের অহংকারের মতো মানুষ জ্ঞানের কারণেও অহংকার করে থাকে। অথচ জ্ঞান বিদ্যার অহংকারে নিমজ্জিত পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করেছেন। সূরা আল মু’মিন-এ যেমন তিনি বলেন,

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

“তাদের কাছে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।”[৫৭]

অর্থাৎ- তাদের কাছে যখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলিলসহ আগমন করতেন, দেখাতেন আল্লাহ প্রদত্ত মু’জিযাহ্ ও পবিত্র তা‘লীম, তখন তারা তাদের দিকে চোখ তুলেও দেখত না; বরং গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং রাসূলদের শিক্ষার প্রতি তারা ঘৃণা প্রদর্শন করত। তারা বলত তারাই বড় ‘আলেম ও বিদ্বান। তাদের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যার কোনো অভাব নেই। মূলতঃ নিজদের অজ্ঞতাকেই তারা জ্ঞান মনে করত। অতঃপর তাদের উপর এমন শাস্তি ও বিপর্যয় পতিত হয় যা তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপের সাথে উড়িয়ে দিত। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

বিপদ বিদূরিত হলেও অনেক মানুষ অহংকারী হয়ে পড়ে। যেমনটি ইতোপূর্বে সূরা আয্ যুমার-এ ও হা-মীম আস্ সাজদাহ্’য় বর্ণিত হয়েছে। সূরা হূদ-এও আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾

“আর যদি তার উপরে আসা দুঃখ-কষ্টের পর তাকে নি‘আমাতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে অবশ্য অবশ্যই বলবে, ‘আমার দূরবস্থা কেটে গেছে’। তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, হয়ে পড়ে অহঙ্কারী।”[৫৮]

অথচ দুঃখ-কষ্ট, বিপদে বান্দাকে যেমন ধৈর্যের সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে বলা হয়েছে তেমনি দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত হলে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে বলা হয়েছে।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ! মু’মিনের জন্য মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি ফায়সালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য্য ধারণ করে, ফলে তখনও সে কল্যাণ লাভ করতে থাকে।”

এমনিভাবে মানুষ তার ধন-সম্পদ, পোষাক-আসাক, বাড়ী-গাড়ী, বিদ্যা-বুদ্ধি, আসবাবপত্রে অহংকারী হয়ে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ অহংকারীকে ঘৃণা করেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মানুষকে অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন ক্ষমতালোভী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করতে। আর তা ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সূরা ইস্‌রা-তে বলেন,

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

“জমিনে গর্বভরে চলাফেরা করো না, তুমি কক্ষনো জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায় পর্বতের ন্যায়ও হতে পারবে না।”[৫৯]

সূরা লুক্বমান-এ বলেন,

---

[৫৭] *সূরা আল মু’মিন : ৮৩।*

[৫৮] *সূরা হূদ : ১০।*

[৫৯] *সূরা ইস্‌রা : ৩৭।*

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

“অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না, আর পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”[৬০]

তাফসীর ইবনু কাসীরে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে তাই বর্ণিত হয়েছে, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যার অন্তরে অনুপরিমানও অহংকার আছে সে উল্টো মুখে জাহান্নামে যাবে।”

সালমাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আন্হা) থেকেও বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মানুষ আত্মগরিমায় এমনভাবে মেতে ওঠে যে, মহান আল্লাহর নিকট তার নাম যালিম ও অহংকারীদের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তখন তার উপর শাস্তি এসে পৌঁছে যা অহংকারী যালিমদের উপর পৌঁছেছিল। এসব কারণে মাদীনার বুকে যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তার শাসকবৃন্দ ও গভর্নরদের জীবনে ক্ষমতার লোভ ও অহংকারের লেশ মাত্র ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোনো কথাই বের হত না। তাদের চলা-ফেরা, চাল-চলন, আচার-আচরণে, পোষাক-পরিচ্ছদে কখনোই উদ্ধত ভাব প্রকাশ পেত না; বরং নম্রতা ও কোমলতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠত। তারা বিজয়ীর বেশে কোনো শহরে প্রবেশ করার সময়ও তাদের চেহারায় কখনোই কোনো প্রকার অহংকার পরিলক্ষিত হত না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অহংকারীকে কোনোভাবেই পছন্দ করেন না যা সূরা আন্ নাহ্‌ল-এ তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

“তিনি অহঙ্কারীদেরকে ভালোবাসেন না।”[৬১]

সূরা আল হাদীদ-এ বলেন,

﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

“কেননা আল্লাহ অহংকারী ও অধিক গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।”[৬২]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যেহেতু মানুষের ভালো-মন্দ, যশ-খ্যাতি, মান-সম্মান, ধন-সম্পদ কোন কিছুতেই মানুষের হক্ব নেই, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এসব দান করেন অথবা যাকে ইচ্ছা এগুলো থেকে বঞ্চিত করেন। অতএব এগুলো নিয়ে কোন প্রকার অহংকার করার সুযোগ মানুষের নেই। বড়ত্ব ও অহংকার কেবল মহান আল্লাহর জন্যই সাজে। সূরা আল জা-সিয়াহ্’য় যেমন বর্ণিত হয়েছে–

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“অতএব প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আসমানের রব্ব, জমিনের রব্ব, বিশ্বজগতের রব্ব। আকাশ ও জমিনে তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।”[৬৩]

মিশকা-তুল মাসা-বীহ-তে আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, অহংকার আমার পরিচ্ছদ এবং শৌর্য আমার পায়জামা। যে একটিও আমার দেহ হতে খুলে নেয়, তার জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খোলা হবে না এবং যে পর্যন্ত উট সূচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যাবে না, সে পর্যন্ত সে বেহেশ্‌তে যাবে না।”

অহংকার ইবলীসকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করেছে

অহংকার শুধুমাত্র ইবলীসের জন্যই অলংকার, ইবলীসের জন্যই প্রযোজ্য। অহংকার করে সে বিতাড়িত হয়েছিল। সূরা আল বাক্বারাহ্’য় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

---

[৬০] *সূরা লুক্বমান : ১৮।*

[৬১] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ২৩।*

[৬২] *সূরা আল হাদীদ : ২৩।*

[৬৩] *সূরা আল জা-সিয়াহ্ : ৩৬-৩৭।*

“যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সাজদাহ্‌ করো, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সাজদাহ্‌ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”[৬৪]

তার ভাগ্য থেকে জান্নাতকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। তাকে করা হলো চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কারণ অহংকারীরা কখনোই জান্নাতে যেতে পারে না। সূরা আল আ‘রাফ-এ যেমন বলা হয়েছে–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ﴾

“যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে আর এ ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত হবে না আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না-যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।”[৬৫]

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ হারেসা ইবনু ওয়াহ্‌হাব (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, “রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বেহেশ্‌তবাসীদের সংবাদ দিব না? প্রত্যেক দুর্বল, বিনয়ী লোক, যদি সে মহান আল্লাহর নামে শপথ করে তা পূর্ণ করে। আমি কি তোমাদেরকে দোযখবাসীদের সংবাদ দিব না? তারা হলো প্রত্যেক অসম্মানিত, কৃপন ও অহংকারী ব্যক্তি এবং প্রত্যেক অসম্মানিত ব্যাভিচারী ব্যক্তি।”

অহংকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি চরম অবমাননাকর শাস্তি। আল্লাহ তা‘আলা অহংকাপরীদেরকে যেমন অপছন্দ করেন তেমনি তাদের হৃদয়ে মোহরও মেরে দেন। সূরা আল মু’মিন-এ তিনি যেমন বলেন,

﴿كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾

“আল্লাহ এভাবে প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর দিলের উপর মোহর মেরে দেন।”[৬৬]

আর অহংকারীরাও এতটাই হতভাগা যে, মহান আল্লাহর কোনো নিদর্শন দেখে তাদের যেমন টনক নড়ে না তেমনি তারা উপকৃতও হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজেই সূরা আল আ‘রাফ-এ তা বলেন,

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

“যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বেড়ায় আমি শীঘ্রই তাদের দৃষ্টিকে আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেব।”[৬৭]

অর্থাৎ- যারা মহান আল্লাহর অনুগত নয়, বিনা কারণে মানুষের কাছে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে তিনি শরিয়ত ও আহকাম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত করে দেন– যা তার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও একত্বের উপর অকাট্য প্রমান। অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾

“আমি তাদের অন্তর ও চক্ষু পরিবর্তন করে দিয়েছি। কেননা তাদেরকে বুঝানো সত্ত্বেও তারা প্রথমবারই ঈমান আনয়ন করেনি।”[৬৮]

তাই বলা হয়ে থাকে– অহংকারীরা কখনো বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। সে তো অহংকারে পরিব্যপ্ত। যে ব্যক্তি অল্পকিছু দিনের জন্য জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, তাকে চিরদিনের জন্য বিদ্যা থেকে বঞ্চিত থাকার লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে।

অহংকারীর ঠিকানা জাহান্নাম

অহংকার কোনো মু’মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি ইবলীস শয়তানের জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ [سجود]

“আমার নিদর্শনাবলীতে কেবল তারাই বিশ্বাস করে যাদেরকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর

---

[৬৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্‌ : ৩৪।*

[৬৫] *সূরা আল আ‘রাফ : ৪০।*

[৬৬] *সূরা আল মু’মিন : ৩৫।*

[৬৭] *সূরা আল আ‘রাফ : ১৪৬।*

[৬৮] *সূরা আল আন‘আম : ১১০।*

সূচীপত্র

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকার করে না।”[সাজদাহ্][৬৯]

সহীহ মুসলিম-এ মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্নাফ, মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার ও ইব্‌রা-হীম দীনার (রাহিমাহুল্লা-হ) কর্তৃক ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ : «إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ».

“নবী (ﷺ) বলেছেন, যার অন্তরে অনুপরিমান অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোষাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহংকার হচ্ছে– দম্ভ ভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।”[৭০]

সহীহ মুসলিম-এ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ থেকে আরো বর্ণিত,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ».

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে যাবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”[৭১]

অর্থাৎ- যার হৃদয়ে ঈমান আছে সে কখনো অহংকার করতে পারে না। কোনো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য অহংকারকে জায়িয করা হয়নি।

ফেরেশ্‌তাগণ নিষ্পাপ এবং ঈমানদার। তাদের হৃদয়ে দানা পরিমাণ অহংকারও নেই তারা অহংকার করতে জানে না। সূরা আন্‌ নাহ্‌ল-এ তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঘোষণা দেন,

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾

“আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আর জীব-জন্তু ও ফেরেশ্‌তারা, সমস্তই আল্লাহকে সাজদাহ্‌ করে; তারা অহঙ্কার করে না।”[৭২]

অর্থাৎ- সমস্ত মাখলুক আরশ থেকে বিছানা পর্যন্ত তার অনুগত ও দাস। জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, মানব-দানব, ফেরেশ্‌তামণ্ডলী এবং সারা জগত তাঁর অনুগত। প্রত্যেকে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সামনে বিভিন্নভাবে নিজেদের দুর্বলতা, অপারগতা প্রকাশ করতে থাকে। তারা ঝুঁকে পড়ে তাঁর পদপ্রান্তে সাজদাবনত হয়। ফেরেশ্‌তাগণও তাদের মান-মর্যাদা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর দরবারে সাজদায় অবনত হন। তাঁর দাসত্বের ব্যাপারে তাদের কোনো অহংকার নেই। মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত মহান আল্লাহর সামনে বিনীত হৃদয়ে তারা কম্পিত হন। তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তাই প্রতিপালনে তারা সদা প্রস্তুত ও ব্যস্ত থাকেন। তারা কোনো অবাধ্যতা করে না, প্রদর্শন করে না বিন্দুমাত্র আলস্য। কারণ তাদের মধ্যে কোনো অহংকার বাসা বাধতে পারে না।

সবশেষে জামে‘ আত্‌ তিরমিযী’তে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে অহংকারীদের শেষ পরিণতি অবলোকন করা যায়। ‘আম্‌র ইবনু শু‘আইব (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বিচারের দিন অহংকারীদেরকে শস্যবীজ সদৃশ মানুষের আকারে উঠানো হবে। অপমান চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঢেকে রাখবে। ইউলুস নামক দোযখের এক বন্দীশালায় তাদেরকে নেয়া হবে এবং দোযখের আগুন তাদেরকে তখন গ্রাস করে নেবে। জাহান্নামের মলমূত্র তাদেরকে পানাহারের জন্য দেয়া হবে।”

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাদেরকে শয়তানের অলংকার থেকে রক্ষা করুন, আমাদেরকে ছোট-বড় সব ধরনের অহংকার থেকে মুক্ত করুন, আমাদেরকে বিনয়ী ও নম্রতা প্রদান করুন –যা একমাত্র জান্নাতবাসীদের জন্য প্রযোজ্য –আমীন। ☐

---

[৬৯] *সূরা আস্‌ সাজদাহ্‌ : ১৫।*

[৭০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৭/৯১।*

[৭১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৮/৯১।*

[৭২] *সূরা আন্‌ নাহ্‌ল : ৪৯।*

কিশোর ভুবন

খলিফা মামুন ও প্রজ্ঞাবান বালিকা

–আরাফাত ডেস্ক

আবূ ‘আব্দিল্লাহ নুমাইরী বর্ণনা করেছেন : একদা আমি কূফায় খলীফা মামূনের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একদল লোক ও লাও লশকর সমবিব্যাহারে শিকারের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করেন। তিনি সবেমাত্র গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হয়েছেন– ইতিমধ্যে একটি শিকার তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি স্বীয় ঘোড়াটির লাগাম শিথিল করে দিয়ে শিকারটির পিছনে লাগিয়ে দেন। শিকার নিজের জীবন রক্ষার্থে যথাশক্তি প্রয়োগ করে পলায়ন করছিল। আর খলীফার ঘোড়াটিও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওর পিছনে ছুটছিল। খলীফার ঘোড়াটি তাঁর সঙ্গীদের ঘোড়াগুলির অগ্রে অগ্রে চলছিল। ওটা শিকারটির পিছনে দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফন দিয়ে ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছে গেল। কিন্তু শিকারকে নাগালে পেল না।

ঘটনাক্রমে একটি বেদুঈন বালিকা খলীফার দৃষ্টিগোচর হলো, যার দৈহিক গঠন ছিল অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয়। ঐ বালিকাটি একটি মশকে পানি ভর্তি করে স্বীয় কাঁধে রেখে নদীর তীর দিয়ে চলছিল। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে তার পা পিছলে যায় এবং উচ্চ শব্দে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে : “আব্বাজান! আমার মশকের মুখ ধরে নিন। ওর মুখ খুলে গেছে এবং ওর মুখ বন্ধ করার শক্তি আমার নেই।”

বালিকাটির বাণী ও কথাবার্তা ছিল বাকপটুতা ও ভাষা অলংকারে পরিপূর্ণ। তার বাণী খলীফা মামূনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে তিনি বিস্ময়াভূত হয়ে পড়েন। আর এদিকে বালিকাটিও তার মশক নিক্ষেপ করে। খলীফা মামূন সামনে অগ্রসর হন এবং বালিকাটির নিকটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করেন : “ওহে বালিকা! তুমি আরবের কোন গোত্রের সাথে সম্পর্কিত?”

বালিকাটি উত্তরে বলে– “আমি বানূ কিলাবের ঐ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত যার লোকগুলো বড়ই ভদ্র ও সম্মানিত হয়ে থাকেন। অতিথিপরায়ণতা তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বিরোধীদের ব্যাপারে উলঙ্গ তরবারির রূপ ধারণা করাই তাদের মাহাত্ম্য এবং প্রধান গুণ।

অতঃপর সে বলতে শুরু করে : “যুবক! আপনি কোন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

খলীফা মামুন : “তুমি কি আরবদের বংশ তালিকার জ্ঞান রাখো?”

বেদুইন বালিকা : “কম বেশি জ্ঞান তো অবশ্যই রাখি।”

খলীফা মামুন : “আমি মুযার গোত্রের লোক।”

বেদুঈন বালিকা : “মুযার গোত্রের কোন শাখা?”

খলীফা মামুন : “মুযার গোত্রের ঐ শাখা যার বংশাবলী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং যার শ্রেষ্ঠত্ব একক। পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়েই ভদ্রতা ও আভিজাত্যের অধিকারী। যার প্রভাব ও প্রতাপে মুযারের সমস্ত গোত্র ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং যার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সর্বজন স্বীকৃত।”

বেদুঈন বালিকা : আমি অনুমান ও অনুধাবন করছি যে, আপনার সম্পর্ক বানূ কিনানার বংশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।”

খলীফা মামূন : “তুমি ঠিকই বুঝেছো।”

বেদুঈন বালিকা : “আপনি কিনানার কোন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন?”

খলীফা মামূন : “ঐ গোত্রের সাথে, যার সন্তানসন্ততি সম্মানিত হয়ে থাকে। যে গোত্রটি প্রকৃতপক্ষে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। দান-খয়রাত যার মাহাত্ম্য। যার প্রভাব ও প্রতাপ কিনানার সমস্ত গোত্রের উপর পরিবেষ্টিত রয়েছে।”

বেদুঈন বালিকা : “হ্যাঁ, তাহলে আপনার সম্পর্ক কুরাইশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে?”

খলীফা মামূন : “তোমার অনুধাবন ও অনুমান মিথ্যা নয় সম্পূর্ণরূপেই সঠিক।”

বেদুঈন বালিকা : “কুরাইশের কোন পরিবার?”

খলীফা মামূন : “যার সুন্দর আলোচনা পর্যালোচনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। যার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের কোনো তুলনা নেই এবং যার ভয়ভীতি কুরাইশের সারা গোত্রের উপর সমভাবে ছেয়ে রয়েছে।”

বেদুঈন বালিকা : “আল্লাহর কসম! আপনি বানূ হাশিম গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।”

খলীফা মামূন : “এটা সম্পূর্ণরূপে সঠিক কথাই বটে।”

বেদুঈন বালিকা : “বানূ হাশিম খান্দানের কোন বংশের সাথে আপনার সম্পর্ক?”

খলীফা মামূন : “এটা ঐ বংশই বটে যার সম্মান ও মর্যাদা সুপরিচিত ও সর্বজনবিদিত। যার মানসম্মান ও মরতবা সর্বোচ্চ, যার ভয়-ভীতি বানূ হাশিমের সমস্ত গোত্রের উপর নিরন্তরভাবেই ছেয়ে থাকে।”

এটা শুনে বেদুঈন বালিকা বলে উঠে– “হে আমীরুল মু’মিনীন! হে খলীফাতুল মুসলিমীন! আপনার উপর প্রশান্তির বারীধারা বর্ষিত হোক।”

এই গ্রাম্য বালিকার মেধাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং বংশ তালিকার জ্ঞানের উপর পূর্ণ দক্ষতা দেখে খলীফা মামূন অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন এবং তার কথায় অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল ও আনন্দিত হন এই ভেবে যে, গ্রামাঞ্চলে এরূপ বালিকাও থাকে, যে এরূপ বুদ্ধিমতি হয়। তিনি বলে উঠেন : “আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এই বালিকাটিকে বিয়ে করবো। কেননা, এটা খুব বড় উপঢৌকন।” খলীফা সেখানেই থেমে গিয়ে স্বীয় সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইত্যবসরে সৈন্য সামন্ত তথায় পৌঁছে যান। অতঃপর খলীফা মামূন বালিকাটির পিতা-মাতাকে বিয়ের পয়গাম দেন। তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে মেয়ে দিতে সম্মত হয়ে যান। অতএব তিনি তাকে বিয়ে করে নিয়ে আনন্দিত চিত্তে ফিরে আসেন। যদিও তাঁর ইপ্সিত শিকার হাত ছাড়া হয়ে গিয়ে ছিল পরবর্তীতে এই বালিকাটিই খলীফা মামূনের পুত্র ‘আব্বাসের মাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ❑

মসজিদের মাইকে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার হুকুম কি?

[২৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেমন- ফেইসবুক, টুইটার ও হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে কিংবা ই-মেইলে ও মোবাইল মেসেজে কারো মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোনো আপত্তি নেই; যদি এর উদ্দেশ্য হয় লোকদেরকে জানাযার নামাযে উপস্থিত করা, মৃতব্যক্তির জন্য দু‘আ ও ইস্তিগফার করা কিংবা মৃতের পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানানো।

শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে পত্র-পত্রিকায় মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : খবর হিসেবে জানানোর ক্ষেত্রে আমরা কোনো আপত্তিকর কিছু জানি না।[৭৩]

শাইখ উসাইমীন বলেন : মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জানানো যদি কোনো কল্যাণের কারণে হয়; যেমন- মৃতব্যক্তির সাথে মানুষের আদান-প্রদানের ব্যাপক লেনদেন থাকে এবং তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হলে তার কাছে কারো পাওনা থাকলে তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কিংবা এ ধরণের আরো কিছু থাকে, তাহলে তাতে কোন আপত্তি নেই।[৭৪]

শাইখ বিন জিবরীন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : নেকির কাজ ও ভালো কাজের মাধ্যমে মশহুর হয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোনো আপত্তি নেই; যাতে করে তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা হয় এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে দু‘আ করা হয়। তবে, এমন প্রশংসা করা জায়িয নয়, যা তাদের মধ্যে নেই।

পরিশেষে বলা যেতে পারে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার সব সুরত-অবস্থা নিষিদ্ধ নয়। শুধু জাহেলীয়াতের সুরাতে যেটা হয় অথবা শুধু সংবাদ প্রচার করা ও তা প্রসিদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয়, সেটা নিষিদ্ধ। আর মসজিদের মাইক বা মিনার শুধু আযানের জন্যই ব্যবহার করা উচিত। তাহলে বিতর্ক থেকে দূরে থাকা যাবে। ❑

---

[৭৩] *মাসায়িলুল ইমাম বিন বায- পৃ. ১০৮।*

[৭৪] *মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলি উসাইমীন- ১৭/৪৬১।*

আলোকিত ভুবন

প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি

সংকলনে- মো. আব্দুল হাই*

সূরা আল ফাতিহাহ্

প্রশ্ন– ১. পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে প্রথম নাযিলকৃত সূরা কোনটি?

উত্তর : সূরাতুল ফাতিহাহ্। *(সূরা আল ফাতিহাহ্- তাফসীর)*

প্রশ্ন– ২. সূরা আল ফাতিহাহ্ যে বারবার আবৃত্তি করার মতো, তা কোন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর : সূরা আল হিজ্‌র (৮৭)।

প্রশ্ন– ৩. হাদীসে কুদসী অনুযায়ী কোন সূরা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বন্টনকৃত?

উত্তর : সূরা আল ফাতিহাহ্। *(সহীহ মুসলিম)*

প্রশ্ন– ৪. 'আস সাবউল মাসানী (সাতটি বারবার পঠিত আয়াত) কোন সূরার অপর নাম?

উত্তর : সূরা আল ফাতিহাহ্। *(সূরা আল হিজ্‌র : ৮৭)*

প্রশ্ন– ৫. "ফাতিহাতুল কিতাব" বা কুরআনের মুখবন্ধ নামে পরিচিত কোন সূরা?

উত্তর : সূরা আল ফাতিহাহ্।

প্রশ্ন– ৬. সূরা আল ফাতিহার কয়েকটি বিশেষ নামের উল্লেখ করুন?

উত্তর : উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল), আস সাবউল মাসানী (সাতটি বারবার পঠিত আয়াত), আশ শিফা (রোগের প্রতিকার), আস সালাত (সালাত) ইত্যাদি।

প্রশ্ন– ৭. প্রশংসা শুধুমাত্র কার জন্যই নিবেদিত?

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ১)*

প্রশ্ন– ৮. রহমান ও রহীম নামের পার্থক্য কিভাবে পরিলক্ষিত হবে?

উত্তর : দুনিয়া ও আখিরাতে। *(তাফসীরে আহসানুল বায়ান- সূরা আল ফাতিহাহ্ : ২)*

প্রশ্ন– ৯. মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম রহমান ও রহীম কেন, কাদের জন্য প্রযোজ্য?

উত্তর : 'রহমান' দ্বারা বিনা পার্থক্যে কাফির ও মু'মিন সকলেই উপকৃত। 'রহিম' শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য আখিরাতে নির্দিষ্ট। *(তাফসীরে আহসানুল বায়ান- সূরা আল ফাতিহাহ্ : ২)*

প্রশ্ন– ১০. দুনিয়ার পাশাপাশি কর্মের মূল প্রতিদান কখন প্রদান করা হবে?

উত্তর : আখিরাতে। *(তাফসীরে আহসানুল বায়ান- সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৩)*

প্রশ্ন– ১১. বিচার বা কর্মফল দিবসের একমাত্র মালিক কে?

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৩)*

প্রশ্ন– ১২. আমরা 'ইবাদত করার পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে কি চাই?

উত্তর : সাহায্য চাই। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৪)*

প্রশ্ন– ১৩. মহান আল্লাহর কাছে আমরা কিসের প্রার্থনা করি?

উত্তর : সরল পথের। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৫)*

প্রশ্ন– ১৪. সরল ও সঠিক পথ বলতে কোনটি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : রাসূল (ﷺ) আনিত ইসলাম। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৫, তাফসীর)*

প্রশ্ন– ১৫. সরল পথে যারা চলেছে, তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কি পেয়েছে?

উত্তর : নিয়ামত, অনুগ্রহ ও পুরস্কার। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৬)*

প্রশ্ন– ১৬. মাগযুবে 'আলাইহিম (ক্রোধভাজন) ও যাল্লীন (পথভ্রষ্ট) কারা?

উত্তর : ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান। *(সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৭)*

---

* *কুপতলা, ধর্মতলা থানা ও জেলা গাইবান্ধা। সাবেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে বাংলাদেশ।*

প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি

সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড থেকে ওয়াহীর সূচনা, পর্ব- ১

প্রশ্ন- ১. ইমাম বুখারী সংকলিত কিতাবে প্রথম কোন হাদীসটি আনা হয়েছে?

উত্তর : সকল কাজের ফলাফল তার নিয়ত অনুযায়ী হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১)*

প্রশ্ন- ২. রাসূল (ﷺ)-এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহীর মধ্যে সবচেয়ে কষ্টদায়ক কোনটি?

উত্তর : ঘন্টাধ্বনির ন্যায় নাযিলকৃত ওয়াহী। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২)*

প্রশ্ন- ৩. তীব্র শীতে নাযিলকৃত ওয়াহীতে রাসূল (ﷺ)-এর কী হতো?

উত্তর : ওয়াহী নাযিল শেষে কপাল থেকে ঘাম ছাড়ত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ৪. 'আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আনহা)'র বর্ণনায়, শুরুতে ওয়াহী নাযিলের সময় রাসূল (ﷺ)-এর অবস্থা কেমন হতো?

উত্তর : নিদ্রা অবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ৫. রাসূল (ﷺ) প্রথম ওয়াহী নাযিলের অনুভূতি কেমন ছিল?

উত্তর : তিনি তখন ভয়ে কাঁপছিলেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ৬. রাসূল (ﷺ) হেরা গুহা থেকে ফিরে খাদিজাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-কে কি বলেছিলেন?

উত্তর : আমাকে চাদরাবৃত করো, আমাকে চাদরাবৃত করো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ৭. খাদিজাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আনহা) রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে কোথায় গেলেন?

উত্তর : ওয়ারাকা ইবনু নাওফেলের কাছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ৮. ওয়ারাকা ইবনু নাওফেল কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

উত্তর : খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ৯. ওয়ারাকা ইবনু নাওফেল কোন ভাষার পণ্ডিত ছিলেন?

উত্তর : ইবরানী (লিখতে পারতেন), ইনজিল (অনুবাদ করতেন)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ১০. ওয়ারাকা কোন নবীর উদাহরণ দিয়েছিলেন?

উত্তর : মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ১১. ওয়ারাকা ইনজিলের জ্ঞান থেকে আগাম কি সংবাদ দিলেন?

উত্তর : রাসূল (ﷺ)-এর স্বজাতি তাকে বহিঃস্কার করবে? *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩)*

প্রশ্ন- ১২. সাময়িক বিরতির পর রাসূল (ﷺ)-এর উপর কোন সূরার আয়াত অবর্তীণ হয়?

উত্তর : সূরা আল মুদ্দাস্‌সির (১-৫)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪)*

প্রশ্ন- ১৩. ওয়াহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল (ﷺ) তা মুখস্ত করার জন্য কি করতেন?

উত্তর : দ্রুত ঠোঁট নেড়ে মুখস্ত করার চেষ্টা করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫)*

প্রশ্ন- ১৪. রাসূল (ﷺ)-এর দানশীলতাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : রহমাতের বায়ুর সাথে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬)*

প্রশ্ন- ১৫. রাসূল (ﷺ)-এর দানশীলতা কোন মাসে সবচেয়ে বেশি বেড়ে যেতো?

উত্তর : রমাযান মাসে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬)*

প্রশ্ন- ১৬. রমাযান মাসে রাসূল (ﷺ)-এর কুরআন তিলাওয়াতের ধরণ কেমন হতো?

উত্তর : জিবরা-ঈল (আলায়হিস্ সালাম) ও রাসূল (ﷺ) একে অপরকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬)*

প্রশ্ন- ১৭. রাজা হিরাক্লিয়াস কোন সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন?

উত্তর : রোমান সাম্রাজ্যের। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ১৮. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে কার মাধম্যে দূত পাঠানো হয়?

উত্তর : দাহিয়াতুল কালবী (রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ১৯. সম্রাট হিরাক্লিয়াসের রাজ দরবারে ঐতিহাসিক কথোপকথনে কে অংশ নেন?

উত্তর : আবূ সুফ্‌ইয়ান ইবনু হারব। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২০. সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাষ্যমতে, রাসূল (ﷺ)-এর বংশ মর্যাদা কেমন?

উত্তর : সম্ভ্রান্ত বংশের। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২১. যুগে যুগে রাসূলদের অনুসারী হয়েছে কারা?

উত্তর : দূর্বল বা নিম্ন শ্রেণি। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২২. রাসূল (ﷺ) সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে হিরাক্লিয়াস কি মন্তব্য করেছিলেন?

উত্তর : রোম সাম্রাজ্য তার পদানত হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২৩. হিরাক্লিয়াস রাসূল (ﷺ)-এর মর্যাদায় কি বলেন?

উত্তর : কাছে থাকলে অবশ্যই তার দু’পা ধুয়ে দিতাম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২৪. হিরাক্লিয়াস কোন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন?

উত্তর : জ্যোর্তিবিদ্যায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২৫. কোন চিহ্নের আবির্ভাবের ব্যাপারে হিরাক্লিয়াস রাসূল (ﷺ)-এর কথা বলেন?

উত্তর : তিনি খাতনা করা জাতির মধ্যে আবির্ভূত হবেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২৬. হিরাক্লিয়াস রাসূল (ﷺ)-কে কি বলে সম্ভাষিত করেন?

উত্তর : এ উম্মাতের বাদশাহ বলে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

প্রশ্ন– ২৭. সত্য জানার পরেও হিরাক্লিয়াস কেনো ইসলাম গ্রহণ করেননি?

উত্তর : জনরোষ ও রাজ্য হারানোর ভয়ে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭)*

মণির খনি

আল ঈমান : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

“জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নাবী রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।” *(সূরা আল আ’রাফ : ৯৬)*

আত্ তাক্বওয়া : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ﴾

“যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্‌ক।” *(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩)*

আল ইসস্তেগফার : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ﴾

“বলেছি– তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।” *(সূরা নূহ্ : ১০-১২)*

আশ্ শুক্‌র : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ﴾

“যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষণা করেন : তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” *(সূরা ইবরা-হীম : ৭)*

কবিতা

কবিতার রূপ

মোল্লা মাজেদ★

জানি কল্পনা নিয়েই কবির কাব্য।
কল্পনাকে নিয়েই কাব্য-মহাকাব্যের ভাণ্ডার স্থাপিত হয়ে,
গড়ে ওঠে কাব্য সাহিত্যের স্থাপত্য।
কল্পনা সঞ্চার করে ভাবের, ভাবের বহিঃপ্রকাশই ভাষা,
আর জীবন ধারার প্রতিফলিত রাগ-অনুরাগ মিশ্রিত
কথার ফুলঝুড়ি সমন্বিত ভাষার লালিত্যই সাহিত্য।
সাহিত্যের নির্যাস নিঃসৃত বাণীতেই সুচিত হয় চেতনার,
আর চেতনার চূড়ান্ত অনুভূতির অনুভবটুকুর বহিঃপ্রকাশই কবিতা।

তাই তো কাব্য প্রেমি পাঠকবর্গ খোঁজে অহরহ, পুষ্পিত কবিতার ফুটন্ত উদ্যান।
মনের দেরাজ খুলে লুকিয়ে লুকিয়ে গন্ধ শুঁকে, সতেজ করে ম্রিয়মান ইন্দ্রীয়গুলোকে।
কবিতা মানে ভাবের দ্যোতনা আর উপমা অলংকার,
মহাভাবের সমাহারে উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ,
বড় কথা প্রশান্তির বিশালতা শ্রুতির মাধুরী পুরা শব্দ চয়ন।
অমৃত প্রবাহিত ব্যঞ্জনা পূর্ণ কাব্য সুধার লোভনীয় স্বাদে
আচ্ছাদিত নিটোল কবিতার অমীয়ধারা,
ভাবের মহাকাশ ছুঁয়ে ভাবুক হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে, জন্ম দেয় আর সব কবিতার।

প্রত্যাশার আগুনে প্রজ্জলিত হয়ে স্বপ্ন নদীর পাড় পেরিয়ে
ইচ্ছের আকাশে দোলায়িত হয়ে মেঘের অরণ্যে বিচরণ করে যে কবিতা,
হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে, কেড়ে নেয় প্রেমাসক্ত অনিকেত মন।
আর যুগ হতে যুগান্তরে মহাকালের বুক চিরে, অনুরক্ত বেদনার সুরে সুরে,
অনন্তের সান্নিধ্য কামনায় চির জাগ্রত রবে শুধু কবিতাই।
আর কবিতাই তো সত্যের সন্ধানি চিরন্তন বাণী অনির্বাণ।
যে বাণীর মাধুরীতে কাটাতে পারে কেউ নির্ঘুম রাত,
সান্নিধ্যেই ধন্য যার সত্যান্বেষী প্রাণ।

অসভ্য আদিমতার কলঙ্কিত কোলাহল কিবা সভ্যতার কাঙ্খিত স্বব্ধতায়
এবং জীবাত্মা পরমাত্মার সান্নিধ্য অন্বেষণের সন্ধিক্ষণে চেতনার দিগ্বলয়ে,
কাব্যিকতার রসনা আর গীতি সুধার সুর সাধনেও কবিতাকে পাই,
প্রশান্তির অন্বেষায় বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর পূর্ণময় সুখ সজীবতায়
তাই তো এ চোখে শুধু স্বর্ণালী স্বপ্ন দিগন্তের কার্ণিশে
রূপালী জ্যোৎস্নার আলোক ছোঁয়া কবিতার রূপ।
আমার দিগ্বলয়ে পরিপূর্ণ পৃথিবীর শেষ কিছু থাক বা না থাক
শুধুই কবিতাগুলো স্বর্ণালী স্বপ্নের গভীর অরণ্যে এসে
হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে এক হয়ে যাক।

মানব নামে দানব

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

যাচ্ছে কমে গাছপালা
        খাচ্ছে মানুষজন
পাচ্ছে দারুণ মজা তাই
        খাচ্ছে গিলে বন।
কাটছে নিজে নিজের গলা
        নাচ্ছে মনের সুখে
হাঁটছে হেসে মরণ পথে
        হাসির রেখা মুখে।
মানুষ হলো মস্তপাঁজি
        বিরাট নিমকহারাম
আপন হাতে খুন করে সে
        আপনজনের আরাম।
বন্ধুকে যে খুন করে রোজ
        খেয়াল খুশি মতো
দানব হলেও নয় সে নিঠুর
        মানবরা হয় যতো।
নিজেকে যে হত্যা করে
        সে বড় নির্দয়
মানব নামে দানব ভরা
        সারাবিশ্বময়।

★ বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।

★ বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

একাকিত্বের সাথে বসবাস : পরিণতি ভয়াবহ

আগের তুলনায় এখন মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এখন অনেকেই একাকিত্বে ভুগছেন। এমনকি বিশ্বব্যাপী মহামারি আঘাত হানার আগে, একটি সুস্পষ্ট বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিভিন্ন দেশে মানুষের একাকিত্ব একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং উপেক্ষিত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শিল্পোন্নত বিশ্বে অতীতের অধ্যয়নগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নিঃসঙ্গতা বাড়ছে, কিন্তু ভৌগোলিক অঞ্চলের সাথে কীভাবে এটি সম্পর্কিত তা তুলনা করে বলা কঠিন।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহামারি বিশেষজ্ঞ মেলোডি ডিং বলছেন, ‘একটি সাধারণ ধারণা থেকে বলা যায় যে প্রায় ১২ জনের মধ্যে ১ জন এমন এক স্তরে একাকীত্ব অনুভব করে যা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে তাঁকে পরিচালিত করতে পারে। তবে এই ধরনের তথ্যের উৎস অস্পষ্ট এবং গবেষকরা কখনই প্রতিষ্ঠিত করেননি যে বিশ্বব্যাপী একাকিত্ব কতটা ব্যাপক। তাই আমরা বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করতে আগ্রহী ছিলাম। ডিং এবং তার সহকর্মীরা তাই ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ১১৩টি দেশ বা অঞ্চল থেকে একাকিত্বের উপর ৫৭টি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা একসাথে সম্পাদন করেছেন।

গবেষক দলটি জানাচ্ছেন, একাকীত্ব মন এবং শরীর সম্পর্কিত, তাই ফলাফলগুলো জনস্বাস্থ্যের উদীয়মান সমস্যাগুলো প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারে যেগুলোকে আরও ভালোভাবে সমাধান করা উচিত।

বৈশ্বিক একাকিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে বেশিরভাগ দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে। ৭৭টি দেশে অনুসন্ধান চালানোর পর দেখা গেছে, একাকিত্বের সমস্যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৯.২ শতাংশ থেকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ১৪.৪ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, ইউরোপীয় অঞ্চলে মেটা বিশ্লেষণের জন্য শুধুমাত্র পর্যাপ্ত ডেটা ছিল।

বিশ্বের এই কোণে, লেখকরা আবার ভৌগোলিক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলোতে নিঃসঙ্গতার হার সবচেয়ে কম ছিল, মাত্র ২.৯ শতাংশ। এই অঞ্চলে ২.৭ শতাংশ মধ্যবয়সী প্রাপ্তবয়স্করা একাকিত্ব অনুভব করার কথা জানিয়েছেন। বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা, ৬০ বছরের বেশি যাদের বয়স তাদের ৫.৩ শতাংশ একাকীত্ব অনুভব করেছেন। অন্যদিকে, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো ইউরোপের অন্য যে কোনও জায়গার তুলনায় একাকিত্বের বেশি লক্ষণ দেখিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের ৭.৫ শতাংশ একাকিত্বের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন, এই অঞ্চলে মধ্যবয়সি প্রাপ্তবয়স্কদের ৯.৬ শতাংশ একাকিত্বের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। ইউরোপের এই অংশে বয়স্করা আগে থেকেই একাকিত্বে ভুগছিলেন, সংখ্যাটাও উদ্বেগজনক ২১.৩ শতাংশ। তবে একটি বিষয় বলা কঠিন, এই ডেটা আমাদের বলতে পারে না কেন পূর্ব ইউরোপে সামগ্রিকভাবে নিঃসঙ্গতার অনুভব বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমগুলোকে আরো জোরদার করার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে একাকিত্ব বুঝার জন্য বেশিরভাগ দেশের ডেটা প্রয়োজন- তবে, ইউরোপের বাইরের বেশিরভাগ অঞ্চলে ডেটার অভাব রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করেছে যে বিপজ্জনক SARS-CoV-2 ভাইরাসকে দূরে রাখার জন্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ব্যবস্থাগুলো সম্ভবতঃ একাকিত্ব, বিষণ্ণতা, ক্ষতিকারক অ্যালকোহল, ড্রাগ ব্যবহার এবং আত্মঘাতী আচরণের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে।

এই গবেষণা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট একাকিত্ব যেকোনো বয়সের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্ব প্রকৃতপক্ষে সিগারেটের মতোই ক্ষতিকারক, যা মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারির তথ্যে দেখা গেছে যে আগের বছরের তুলনায় আজ অনেক বেশি তরুণ এবং মধ্যবয়সি মানুষ একা বাস করছে। কিন্তু ইউরোপীয় পর্যালোচনায় মনে হয় বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা, যাদের বয়স ৬০ বছরের বেশি, তারা সবচেয়ে তীব্র একাকিত্বের অনুভূতিতে ভোগে।

যখন আমাদের জীবন আক্ষরিক অর্থে অন্যদের সাথে সংযোগের উপর নির্ভরশীল তখন এটি দুর্ভাগ্যজনক যে এতদিন একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বিশদে কোনো গবেষণা করা হয়নি। এখন বৈশ্বিক মহামারি আমাদের এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে যেমনটি আগে কখনো হয়নি এবং ডিং-এর মতো গবেষকরা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন যাতে আমরা ভবিষ্যতের বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

আইরিশ এবং যুক্তরাজ্যের একটি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ দল নতুন গবেষণার সাথে যুক্ত একটি সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো যেমন দারিদ্র্য, শিক্ষা, বৈষম্য, বাসস্থান এগুলোর দিকে নজর দিলে এবং সঠিক নীতির বাস্তবায়ন করলে একাকীত্বের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং কাজের পরিবেশের পরিবর্তন একাকিত্বের মোকাবেলা করতে পারে। *[সূত্র : www.sciencealert.co, মানবজমিন]*

হাত-পা অবশ হওয়া কোন কোন মারাত্মক রোগের লক্ষণ হয়

হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া কোনো সাধারণ রোগের লক্ষণ নয়; বরং তা সতর্ক সংকেত জানিয়ে দেয় যে, আপনার জীবনে আসতে চলেছে বড়ো ধরনের কোনো অসুখ।

বাহু বা কব্জির কোনো একটি স্নায়ু বা স্নায়ুগুচ্ছ যদি কোনো কারণে সংকুচিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে অনেক সময় হাত অবশ হওয়ার অনুভূতি হয়। ডায়াবেটিসের কারণে পেরিফেরাল স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, আঘাতের কারণে সংক্রমণ এবং বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শের ফলে আমাদের হাত অবশ হবার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি পায়ের পাতা অবশ হয়েছে এবং তাতে জ্বালা করছে এবং মনে হচ্ছে কেউ যেনো সুঁই দিয়ে জায়গাটাকে খোঁচাচ্ছে। এই রকম অনুভূতির কারণ হলো মেরুদণ্ডের নিচের অংশে স্নায়ু মূলে যন্ত্রণা হওয়া। এই অনুভূতিগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। হাতের উপর দীর্ঘক্ষণ ঘুমান বা পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেন অথবা নড়াচড়া না করে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন তবে হাত বা পা অবশ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তবে এমন অদ্ভূত অনুভূতি যদি প্রায়ই হয় তাহলে দ্রুত চিকিতৎসকের পরামর্শ নিন। না হলে আপনি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।

জেনে নেয়া যাক হাত-পা অবশ হওয়ার অনুভূতি কোন কোন মারাত্মক রোগের লক্ষণ হয়?

১) বর্তমান সময় বেশিরভাগ মানুষই ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ হলো পেরিফেরাল স্নায়ু। এর ফলে পায়ের পাতা অবশ হয়ে যাওয়ার অনুভব হয় এবং তা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে।

২) সিস্টেমিক ডিজিজের জন্যেও অনেক সময় হাত পা অবশ হয়ে যাওয়ার অনুভূতি ঘটে। সিস্টেমিক ডিজিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো কিডনি রোগ, ভাস্কুলার ডিজিজ, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী টিউমার যা স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে ইত্যাদি রোগগুলো সিস্টেমিক ডিজিজের অন্তর্ভুক্ত।

৩) যদি হালকাভাবে হাত পা অবশ থাকে তাহলে এটিকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ অনেক সময় দেখা যায় এটি একটি মাল্টিপল ক্লোরোসিস এ পরিণত হয়ে যায়। এই সমস্যার জন্য স্নায়ুতন্ত্রের মায়োলিন সিথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) পায়ের পাতার পেছনের অংশে গোড়ালির ভেতরের দিকে টানেল সিনড্রোম থাকে। গোড়ালির ভেতরের টিবিয়াল স্নায়ুর সংকোচনের ফলে হয় অসাড়তা। ডাক্তার না দেখালে এই সমস্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫) শরীরের যেকোনো অংশে আঘাতের কারণে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতস্থানে তীব্র যন্ত্রণা ও জ্বলুনি অনুভব হয়।

৬) হৃদপিণ্ড যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করতে পারে না তখন স্ট্রোক হয়ে যায়। রক্তনালীগুলো ব্লক হলে স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের আগে অনেক সময় বাম হাত থেকে তালু পর্যন্ত অবশ হতে অনুভব করা যায়।

৭) লাইম ডিজিজের জন্য হাত পা অবশ হয়ে যায়। লাইম ডিজিজ হলো একটি পতঙ্গবাহিত ইনফ্লামেটরি ডিজিজ যা দ্রুতগতিতে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো ক্লান্তি, জ্বর, পেশী ও জয়েন্টের ব্যথা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া এবং লিম্ফ নোড ফুলে যাওয়া। এই অসুখ হলে খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় চিকিৎসা যদি না করানো হয় তাহলে স্নায়ুর জটিলতা অবশ্যম্ভাবী।

৮) ফাইব্রোমায়ালজিয়া সকালে হাত পা অবশ হওয়ার অনুভূতি হয়। এই রোগটি হলো মস্তিষ্কের একটি রোগ। এই রোগের লক্ষণ হলো পেশীতে ব্যথা, স্মৃতির সমস্যা এবং মেজাজ পরিবর্তন, হাত এবং পা অবশ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা যায়।

যেসব ভুলে দেখা দিতে পারে মাইগ্রেন সমস্যা

মাইগ্রেন সমস্যাটি অনেকের কাছেই পরিচিত। মাইগ্রেন এক বিশেষ ধরনের মাথাব্যথা। তবে সাধারণ মাথাব্যথার সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। এই ব্যথা মাথার কোনো একদিক থেকে শুরু হয়। যন্ত্রণাদায়ক এবং অনেক বেশি সময় ধরে থাকে। সে সাথে অস্বস্তিকর ভাব এবং বমি বমি লাগে।

জেনে নেয়া যাক যেসব কারণে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে–

এটি মূলতঃ জিনঘটিত রোগ। পরিবারের কারও থাকলে অন্য সদস্যের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মস্তিষ্কের 'ট্রাইজেমিনাল নার্ভ' উত্তেজিত হলে এই ব্যথা দেখা দেয়।

✍ কাজের ব্যস্ততায় মাঝেমধ্যেই আমরা খেতে ভুলে যাই? বেশি সময় খালি পেটে থাকলে মাইগ্রেনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ✍ কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে ব্যায়াম শুরু করলে মানবদেহে ইলেকট্রোলাইটের মাত্রা কমে যায়। এতে মাইগ্রেনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

✍ নিয়মিত বেকন, হটডগ, পিৎজার মতো প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার কারণেও মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হতে পারে। সবারই উচিত ভাঁজাপোড়া কম খাওয়া। ✍ অনেকেই আমরা শীতকালে পানি কম খাই। আবার গরমকালেও কেউ কেউ পানির দিকে নজর রাখে না। শরীরে পানির ঘাটতি থাকলেও দেখা দিতে পারে মাইগ্রেনের সমস্য। শীত কি গরম, সবসময় পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।

✍ কড়া রোদে থাকলে মাথা দপদপ করে ওঠে। যা মাইগ্রেনের অন্যতম লক্ষণ। কড়া রোদ এড়িয়ে চলতে হবে। সে সঙ্গে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে হবে।

✍ বিকট বা উচ্চশব্দ ও তীব্র কোনো গন্ধযুক্ত পরিবেশে থাকার কারণে অনেক সময় মাইগ্রেনের সমস্যা হতে পারে।

✍ অসময়ে ও অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে মাথাব্যথা হয়ে থাকে। যা মাইগ্রেনের লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে।

✍ অতিরিক্ত পরিমাণে মিষ্টি খাবার খাওয়ার কারণেও মাইগ্রেনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এতে রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যায়। যা অতিরিক্ত ইনসুলিন উৎপাদন করে। আবার পরে রক্তে সুগারের মাত্রা কমে যায়। এই তারতম্যের কারণে দেখা দিতে পারে মাইগ্রেনের সমস্যা।

[সূত্র : মানবজমিন]

সূচীপত্র

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***ফজরের সালাতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের পর ওয়াক্তভিত্তিক কোন বিশেষ সূরা পাঠের নির্দেশ আছে কি? না যে কোনো সূরা পড়লেই চলবে? কিরআত পঠে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত কি? সংক্ষেপে হলেও আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আহসান ফিরোজ
তানোর, রাজশাহী।

জবাব : ফর্য সালাতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করার পর রাসূল (ﷺ) বিভিন্ন ওয়াক্তে বিভিন্ন সূরা পাঠ করেছেন। যেমন- কখনও মাগরিবে সূরা আল আ'রাফ পাঠ করেছেন। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৬৪)***

ফজরে সূরা আল মু'মিনূন ও যোহরে সূরা লুক্বমা-ন পাঠ করেছেন। ***(সুনান আন্ নাসায়ী, সহীহ মুসলিম- হা. ৪৫৫)***

অনুরূপভাবে মাগরিব ও ‘ইশাতে কখনও ছোট ছোট সূরা দিয়ে সালাত সমাপ্ত করেছেন। জুমু‘আর দিন ফজরে সূরা আস্ সাজদাহ্ ও আদ্ দাহ্র পাঠ করেছেন এবং জুমু‘আর সালাতে সূরা আল আ'লা, আল গা-শিয়াহ্ বা আল জুমু‘আহ্ ও আল মুনা-ফিকূনও পড়েছেন। তবে আল কুরআন হতে যে কোন সূরা বা কিছু তিলাওয়াত করলেই সালাত সহীহ হয়ে যাবে।

কেননা, রাসূল (ﷺ) বলেন :

«ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

“অতঃপর কুরআনের যা তোমার জন্য সহজ হয়, তা পাঠ করো!” ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৫৭, ৭৯৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৪৫/৩৯৭)***

অতএব, আপনার মুখস্থ থাকলে হাদীসে বর্ণিত সূরা দ্বারা নির্ধারিত ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে চেষ্টা করবেন। এতে সুন্নাতের উপর ‘আমল হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কুরআন থেকে যা পাঠ করা আপনার জন্য সহজ হবে তা পাঠ করে সালাত আদায় করবেন। আপনার সালাত সহীহ হবে।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আল্লাহ তা‘আলা নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান –এমন ‘আক্বীদাহ্ পোষণ করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে কি?***

পারভিন আক্তার
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

জবাব : আল্লাহ তা‘আলা নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান এমন ‘আক্বীদাহ্ পোষণ বিনষ্ট ঈমানের পরিচায়ক। আল্লাহ তা‘আলাকে নিরাকার জানা এবং সর্বত্র বিরাজমান জানা কুরআন কারীম এবং হাদীসে নাব্বীর অসংখ্য প্রমাণাদির সম্পূর্ণ বিপরীত; বরং এটি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার জাত বিশ্বাস। এমন বিশ্বাস কোনো ব্যক্তিকে ঈমানহীন করে দিবে। এ মর্মে সংশয়হীন প্রমাণ হলো– আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

“দয়াময় আল্লাহ মহান আরশে সমাসীন হলেন।” ***(সূরা ত্ব-হা- : ৫)***

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী, জমিন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।” ***(সূরা আস্ সাজদাহ্ : ৪)***

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ক্রীতদাসীর ঈমানের পরীক্ষা নিতে জিজ্ঞেস করেন,

«أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ : فِىْ السَّمَاءِ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ : «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

অর্থাৎ- “আল্লাহ তা‘আলা কোথায়? সে বলল : আসমানে। তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি কে? তখন সে বলল : আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন

নবী (ﷺ) বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও, নিশ্চয়ই সে একজন ঈমানদার নারী।” ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৩৭)***

উল্লেখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সাহাবাগণের ‘আক্বীদাহ্ ছিল আল্লাহ তা‘আলা আসমানে। এতদসঙ্গে এটিও প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহকে আসমানে থাকা বিশ্বাস করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই মর্মে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)’র বক্তব্য স্পষ্ট এবং চমৎকার। তিনি বলেন :

من قَالَ لَا اعرف رَبِّيْ فِيْ السَّمَاء ام فِيْ الأَرْض فقد كفر لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰى الْعَرْشِ اشتوى وعرشه فوق سبع سموات.

“যে বলবে আমার রব (আল্লাহ) আসমানে আছেন, না জমিনে আছেন, তা আমি জানি না, সে কুফ্‌রী করবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, দয়াময় আরশে সমুন্নীত। আর তার আরশ সপ্ত আকাশের উপর।” ***(আল ফিকহুল আকবার- পৃ. ৫১; ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যাহ- পৃ. ৯৯)***

জিজ্ঞাসা (০৩) : অনেক মসজিদে দেখা যায়, ফর্‌য সালাতের পর ঈমান ও ‘আমল বিষয়ক বয়ান শুনার ই‘লান দেয়া হয়। তাতে গায়রে ‘আলেম ব্যক্তিরা বয়ান করে থাকেন –এই কাজ কতটুকু ইসলাম সম্মত?

মুরাদুজ্জামান
শার্শা, যশোর।

জবাব : মসজিদের দার্‌সসমূহে বয়ান দেয়া ‘আলেমগণের করণীয় এবং তাদের হক্ব। ঈমান, ‘আমল এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণই বক্তব্য রাখবেন, ‘আলেমগণের স্থলে শরিয়ার জ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিদের বয়ান পেশ গোমরাহী এবং কিয়ামতের আলামত। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

«إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا».

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা একবারে ‘ইল্‌মকে গুটিয়ে নিবেন না। তার বান্দাদের ছিনিয়ে নেয়ার মতো (মৃত্যু দান) করে; বরং ‘আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে ‘ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন। এমন হবে যে, ‘আলেম থাকবে না, তখন মানুষেরা জাহেলদেরকে নেতা মানবে। তাদেরকে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা বিনা ‘ইল্‌মে ফাতাওয়া দিবে, নিজেরাও গোমরাহ হবে, লোকদেরকেও গোমরাহ করবে।” ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১০০)***

দীনি ‘ইল্‌মে অজ্ঞরা যখন মানুষদেরকে দীন শিক্ষা দিবে তখন গোমরাহী অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। বস্তুতঃ বর্তমান অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে এবং এটি কিয়ামতের আলামতও বটে।

এই প্রসঙ্গে আশ্ শাইখ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, কিছু গ্রন্থাদি পড়ে বা কিছু শুনে তা প্রচার করা যাবে না যতক্ষণ না ব্যক্তি ‘ইল্‌ম অর্জন করবে এবং বই-পুস্তকেও শুনা বক্তব্যের ভুল-ত্রুটি উপলব্ধি করতে পারবে। ***(আশ্ শাইখ ইবনু উসাইমিন- কিতাবুদ্ দা‘ওয়াহ, ২/১৮১)***

প্রকৃতপক্ষে ‘ইল্‌মবিহীন কথা বলা এবং বক্তব্য উপস্থাপন করা ভয়াবহ পাপের কাজ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

“যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে তুমি কথা বলো না, নিশ্চয়ই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ সবকিছুকে জবাবদিহী হতে হবে।” ***(সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩৬)***

দা‘ওয়াতের মূল বৈশিষ্ট্য হবে, দা‘ওয়াতদাতাকে ‘ইল্‌ম ও প্রজ্ঞায় প্রত্যয়শীল হতে হবে। তাকে প্রকৃত জ্ঞানে প্রদীপ্ত হতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

“তুমি বলো– এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি এবং আমার অনুসারীরা দিব্য জ্ঞান নিয়ে আহ্বান জানাই; আল্লাহ মহান ও পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।” ***(সূরা ইউসুফ : ১০৮)***

জিজ্ঞাসা (০৪) : আমরা সালাত আদায় করার সময় মাথায় টুপি দিয়ে থাকি। কখনও দেখা যায় সালাতরত অবস্থায় মাথা হতে টুপি পড়ে গেছে। এক্ষুণে আমার

প্রশ্ন– সালাত অবস্থায় ঐ টুপি তুলে মাথায় দেয়া যাবে কি-না? মেহেরবানী করে জানাবেন।

মোবারক হোসেন
বিরল, দিনাজপুর।

জবাব : মুসলিমরা যে টুপি পরেন, তা মাথায় দেওয়া একটি সাধারণ 'আমল এবং ভদ্রতার পরিচায়কও। অনেকেই পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরাকে ইয়াহূদীদের আবিস্কৃত 'আমল বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই সালাতরত অবস্থায় টুপি মাথা হতে পড়ে গেলে এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। কারণ টুপি মাথা থেকে পড়ে গেলে সালাতের কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি তা উঠাতে গিয়ে অতিরিক্ত কাজের জন্য সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই সেদিকে খেয়াল না করাই ভালো।

জিজ্ঞাসা (০৫) : অনেক ধার্মিক লোকদেরকেও দেখা যায় ছেলে-মেয়েদের জন্ম দিবস এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বার্ষিকী পালন করাকে স্বাভাবিক এবং আধুনিকতা মনে করে। এ বিষয়ে সঠিক ফায়সালা জানতে চাই।

রায়হান কবীর
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

জবাব : ইসলামী শরিয়তে জন্ম দিবস এবং বিবাহ বার্ষিকী পালন বৈধ নয়; বরং এগুলো হলো খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করা। জন্ম দিবস ও বিবাহ বার্ষিকী পালনের মতো কাজ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে এবং সাহাবা (রযিয়াল্লা-হু আনহু)-গণের জীবনীতে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ধরণের বিধর্মী কালচারকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

"ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনো খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের রীতি-নিতির অনুসরণ করো। বলো– আল্লাহর পথ নির্দেশই প্রকৃত পথ নির্দেশ। তোমার কাছে 'ইল্‌ম আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।" ***(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২০)***

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন বলেন : "কোন ব্যক্তি তার নিজের বা তার সন্তানদের জন্ম দিবস পালন করা, কিংবা বিবাহ বার্ষিকী পালন করা শরিয়ত বহির্ভুত কাজ।" ***(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম- পৃ. ১৭৬)***

জিজ্ঞাসা (০৬) : মৃত ব্যক্তিকে "ইয়া" বা "আইয়্যুহা" দ্বারা সম্বোধন করা যাবে কি-না? যেমন- ইয়া নবী! ইয়া 'আলী! ইত্যাদি বলে ডাকা– কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

আবূ মুহাম্মদ
টঙ্গি, গাজীপুর।

জবাব : 'ইয়া' বা 'আইয়্যুহা' অব্যয় দু'টি সামনে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে ডাকার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন- ইয়া খালিদ! অর্থ : হে খালিদ! দূর থেকে কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে 'হে' বলে ডাকা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। এমনটি বাস্তবতার বিপরীত। শুধু তাই না, এটি নির্বুদ্ধিতা বা বোকামীর পরিচায়ক। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে 'হে, হে' বলে ডাকলে সে শুনবে না। আর মানুষ এরূপ আহ্বানকারীকে নিছক বোকা বা পাগল বলে মনে করবে। মানুষ মরে যাওয়ার পর সে দূরে চলে যায়। ইন্দ্রিয়শক্তি উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তাকে কেউ কিছু শুনাতে পারে না। সে কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেন :

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ○ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ○ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ○ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং না অন্ধকার ও আলো সমান এবং না ছায়া ও রৌদ্র। আর সমান নয় জীবিত ও মৃতরাও। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, ক্ববরবাসীকে তুমি শুনাতে পারবে না।" ***(সূরা ফা-ত্বির : ১৯-২২)***

এ আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, মানুষ মরে গেলে তাকে কেউ ডাকলে সে শুনবে না। অতএব, মৃত ব্যক্তিকে "ইয়া" বা "আইয়্যুহা" দ্বারা সম্বোধন করা যাবে না। তবে তাদের ক্ববরের পাশে উপস্থিত হলে নিকটবর্তী হওয়ায় ক্ববরবাসীকে "ইয়া" বা "আইয়্যুহা" দ্বারা সম্বোধন করা জায়িয। এরূপ 'আমল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৯৭৫)***

এছাড়া "ইয়া" বা "আইয়্যুহা" দ্বারা সম্বোধন করা যায় ঐ সত্তাকে, যার কাছে দূর ও নিকট সমান। আর তিনি

হচ্ছেন– আল্লাহ। কাজেই তাঁকেই কেবল ‘ইয়া’ বা ‘হে’ দ্বারা সর্বাবস্থায় ডাকা যাবে। যেমন- ‘ইয়া আল্লাহ! অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমাকে ডাকছি, তোমার সাহায্য চাচ্ছি এবং তোমারই কাছে আমার যত চাওয়া-পাওয়া। মূলতঃ এ ডাক মানে ‘ইবাদত। আর যাবতীয় ‘ইবাদতের একমাত্র হক্বদার আল্লাহ।

মুহাম্মাদ (ﷺ) মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা ও রাসূল। তাঁর মৃত্যু হয় ১১ হিজরিতে। তাঁকে গোসল দেওয়া হয়েছে, জানাযার সালাত পড়া হয়েছে এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছে। কাজেই তাঁকে ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ!’ বলে দূর থেকে ডাকা যাবে না। তাঁর ক্ববরের কাছে গেলে ‘ইয়া’ বলে সম্বোধন করে ডাকা যাবে। আর দূর বা কাছ থেকে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করলে তা তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ.

“তোমরা আমার ক্ববরকে উৎসব স্থল হিসেবে গ্রহণ করো না, তোমাদের ঘরসমূহকে ক্ববর বানাবে না। আর তোমরা যেখানেই থাকো– আমার প্রতি সালাত তথা দরূদ পাঠ করো। নিশ্চয় তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছে।” ***(মুসনাদে আহমাদ- হা. ৮৮০৪)***

উল্লেখ্য যে, ‘ইয়া ‘আলী! বলে ডাকা শিয়াদের শির্‌কী ‘আমল। এটা হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে; নতুবা শির্‌কের মহা পাপে অভিযুক্ত হতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***আমি মাঝে মাঝে নফল সিয়াম পালন করি। কখনো অসুবিধায় পড়ে তা ভাঙ্গতে হয়। আমাকে একজন ‘আলেম বললেন : সিয়ামের নিয়্যাত করলে না কি তা ছাড়া নিষেধ! আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে আপনাদের স্মরণাপন্ন হলাম। আশাকরি সঠিক উত্তর পাব।***

আবিদুর রহমান আযাদ
পুঠিয়া, রাজশাহী।

জবাব : নফল সিয়াম প্রয়োজনে ছেড়ে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। নফল সিয়াম ঐচ্ছিক; আবশ্যক নয়। তাই সিয়াম পালনকারী নিজে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সিয়াম পূরা করবে কিংবা ছেড়ে দেবে। একদা রাসূল (ﷺ) ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন– খাবার কিছু আছে কি? তখন ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর (ﷺ) জন্য ছাতু পেশ করলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : “আমি সিয়াম অবস্থায় সকাল করেছি। অতঃপর (সিয়াম ভেঙ্গে) তাথেকে কিছু খেলেন।” ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৪)***

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নফল সিয়াম পালনকারী তার ইচ্ছানুযায়ী সিয়াম ছাড়তে পারে। তাছাড়া সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নফল সিয়াম ভাঙ্গাকে কিছুই মনে করতেন না। ***(মুসান্নাফ ‘আব্দুর রায্‌যাক্ব- হা. ৭৭৬৭)***

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমার কলেজের কয়েকজন হিন্দু বন্ধু রয়েছে। তাদের পূজা পার্বনে আমাকে আমন্ত্রণ করে, আমি কিছু না খেলেও তাদের সাথে তাদের পূজা অনুষ্ঠানে সৌজন্য দেখা করে আসি– এটাতে কি আমার পাপ হবে?***

কামাল উদ্দীন
কবুরহাট, কুষ্টিয়া।

জবাব : কলেজে বা ব্যবহারিক জীবনে হিন্দুদের সাথে সৌজন্য সম্পর্ক রক্ষা ছাড়া আন্তরিক কোনো সম্পর্ক রাখা হারাম। তাদের পূজা পার্বনে সৌজন্য গমন হারাম এবং শির্‌কী কাজে সাহায্যের শামিল। এটি শির্‌ক ও কুফ্‌রী কাজে ঘৃণা না করে সমর্থনের নামান্তর।

আপনার উপর ওয়াজিব হলো তাদের ধর্মীয় পূজা পার্বণকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করা। যেমনটি ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾

অর্থ : “তোমাদের জন্য ইব্‌রা-হীম ও তার সাথীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সাথে ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা করো তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা থাকবে।” ***(সূরা আল মুমতাহিনাহ্ : ৪)***

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***বিপদে পড়লে তা থেকে উদ্ধার পেতে কোনো সহীহ দু‘আ আছে কি? দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।***

আরেফিন সিদ্দিক
মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

জবাব : বিপদ-মুসীবতে সবর করা বলিষ্ঠ ঈমানের পরিচায়ক। আর সবর মহান আল্লাহর ক্বাযা ও ক্বদরের প্রতি ঈমানের একটি অংশ। যারা সবর করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অগণিত সওয়াব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"নিশ্চয়ই সবরকারীদেরকে অসংখ্য-অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে।" *(সূরা আয্ যুমার : ১০)*

বিপদের প্রথম ধাক্কায় সবর করে আল্লাহ তা'আলার কাছে তার বিনিময় চাইতে হবে। বিপদ-মুসীবত আপতিত হলে হাদীসে বর্ণিত যে কোন একটি দু'আ পাঠ করা যায়। তবে নিম্নোক্ত দু'আটি অধিক কার্যকর। মহিলা সাহাবী উম্মু সালামাহ্ এটি পাঠ করে উত্তম বিনিময় পেয়ে ধন্য হয়ে ছিলেন। আর তা হচ্ছে– তাঁর স্বামী আবূ সালামাহ্'র মৃত্যুতে সবর করে তিনি পরবর্তীতে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ([illegible] আলাইহে [illegible])-কে পেয়ে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবতী হন। দু'আটি এই–

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَأَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا.

"হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে সবরের বদলা দিন এবং আমাকে এর চেয়ে ভালো প্রতিদান দান করুন!" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২১৬৫)*

জিজ্ঞাসা (১০) : ***মৃত্যুর ফেরেশ্‌তাকে আমরা আজরাঈল বলে জানি। কুরআন ও হাদীসের কোথাও কি এ নামটি রয়েছে?***

নুসরাত ইসলাম,
বনানী, ঢাকা।

জবাব : কুরআন ও হাদীসের কোথাও মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার নাম আজরাঈল বলে উল্লেখ করা হয়নি; বরং কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ ফেরেশ্‌তার নাম মালাকুল মাওত বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ﴾

"বলো, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের আত্মা হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে।" *(সূরা আস্ সাজদাহ্ : ১১)*

উক্ত আয়াতে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তাকে স্পষ্টতই 'মালাকুল মাওত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, "আজরাইল নামটি প্রসিদ্ধ হলেও এটি সঠিক নয়, ইয়াহূদীর কিছু বর্ণনা থেকে এটি এসেছে। এমনতর নামে বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য নয়। আমরা বরং আল্লাহ তা'আলা যে নাম দিয়েছেন 'মালাকুল মাওত' সে নামে ডাকব।" ***(ফাতওয়া ইবনু উসাইমিন- ৩/১৬১)***

জিজ্ঞাসা (১১) : ***জিন্ জাতির আদি পিতা কে? এ বিষয়ে কোনো প্রমাণযোগ্য বক্তব্য আছে কি? দয়াকরে জানিয়ে উপকৃত করবেন।***

আবু বকর সিদ্দিক
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : জিন্ জাতির আদি পিতা নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। তবে সাহাবী ইবন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু), মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্ ও হাসান আল-বসরী (রাহিমাহুল্লা-হ) প্রমূখ উক্ত অভিমত গ্রহণ করেছেন। ***(ইমাম কুরতুবী 'আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন'- ১/৫০৭)***

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাও একই মত পোষণ করেন। ***('মাজমূ'ঊ ফাতওয়া'- ইবনে তাইমিয়্যাহ, ৪/২৩৫)***

তাদের অভিমতের পক্ষে বলিষ্ঠ দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী–

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا﴾

"আর যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম– আদমকে সাজদাহ্ করো! তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সাজদাহ্ করল। সে ছিল জিন্‌দের একজন। সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। অতএব, তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালীমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল।" ***(সূরা আল কাহ্‌ফ : ৫০)***

কাজেই উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির জিন্‌দের আদি পিতা হলো ইবলিস। অতঃপর একদল তার অনুসারী হয়ে কাফির হলো এবং অপর দল মু'মিন জিন্ হিসেবে পরিচিত লাভ করল। আল্লা-হু 'আলাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

ডাবলিন মসজিদের পটভূমি

–আবু ফাইয়ায

ডাবলিন মসজিদের পটভূমি : ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন ডাবলিনে কোনো মসজিদ ছিল না, তখন মুসলিম ছাত্ররা ডাবলিনে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের আত্মীয়-স্বজন, যুক্তরাজ্যের ইসলামিক সংগঠন এবং কিছু মুসলিম দেশের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করে। ১৯৭৪ সালে একটি চার তলা বাড়ি কেনা হয় এবং ১৯৭৬ সালে প্রথম মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার খোলা হয়। যারা এই প্রকল্পে উদারভাবে অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আযীয।

প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই মসজিদটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মুসল্লিদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই বড়ো মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি ‘তহবিল সংগ্রহ’ অভিযান শুরু করতে হয়। ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ সার্কুলার রোডের বর্তমান মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ভবনটি কিনে মসজিদে রূপান্তর করা হয়।

১৯৮৫ সালে মসজিদের আয়তন বাড়ানোর জন্য একটি বারান্দা যুক্ত করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডাবলিনে মুসলিমদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। ফলে মসজিদের প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো থেকে মুসল্লিগণ যথাযথ উপকৃত হতে পারছেন না, বিশেষ করে শুক্রবারে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মুসল্লিদের সুবিধাবঞ্চিত হতে হচ্ছে। বর্তমানে এবং শুক্রবারে স্থান স্বল্পতার কারণে কেউ কেউ মসজিদের বাইরে নামায আদায় করেন। এটি কখনও কখনও ঠাণ্ডা এবং ভেজা আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে ঘটে। এই পরিস্থিতি আয়ারল্যান্ডের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রশাসনকে মসজিদের সম্প্রসারণ বিবেচনা করতে উৎসাহিত করেছিল। পরিকল্পনা মোতাবেক ডাবলিন সিটি কাউন্সিলের কাছে আবেদন করা হয়েছিল এবং তা অনুমোদিত হয়েছিল।

প্রস্তাবিত বর্ধিতকরণের মধ্যে প্রধান মসজিদ সংলগ্ন বিল্ডিংয়ে একটি দ্বিতীয় তলা নির্মাণ করা হয় এবং মূল মসজিদের বারান্দার সাথে সংযুক্ত করা হয়। বর্তমান পুরুষদের টয়লেট ও ওযূখানার পাশাপাশি উপরের তলায় মহিলাদের জন্য নতুন ওযূখানা তৈরি হয়। মসজিদ ও ওযূ এলাকায় একটি বড়ো প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়। মাদ্রাসা ও মহিলা এলাকায় নির্মিত দ্বিতীয় তলা শুক্রবারে নামাযের জন্য এবং অন্যান্য দিনে শিক্ষাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য একটি অতিরিক্ত জায়গা প্রদান করা হয়।

ডাবলিন মসজিদ আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে অবস্থিত একটি মসজিদ। এটি ডাবলিনের দক্ষিণ সার্কুলার রোডে অবস্থিত। এ মসজিদেই আয়ারল্যান্ড ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদর দফতর স্থাপিত।

১৯৮৩ সালে দক্ষিণ সার্কুলার সড়কের এই ভবনটি আয়ারল্যান্ড ইসলামী ফাউন্ডেশন কিনে নেয় ও মসজিদে রূপান্তরিত করে। আয়ারল্যান্ড ইসলামী ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই আয়ারল্যান্ডের মুসলিমদের দাপ্তরিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। এটি আয়ারল্যান্ডের মুসলিমদের ধর্মীয়, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক প্রয়োজন দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

আয়ারল্যান্ডে ইসলামের বিকাশ : উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ছিমছাম সাজানো-গোছানো ছোট্ট স্বর্গীয় দ্বীপ আয়ারল্যান্ড। এর আয়তন ৩২ হাজার ৫৯৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৬৫ লাখ ৭২ হাজার ৭২৮ জন। এখানকার সবচেয়ে বড়ো শহর ডাবলিন। উত্তর-পশ্চিমা বিশ্বের অন্য দেশের মতো আয়ারল্যান্ডেও আছে মুসলিম অধিবাসী। পশ্চিমের অন্য দেশের চেয়ে এখানে কম বয়সের মুসলমানের সংখ্যায় তুলনামূলক বেশি। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, ২০১৬ সালে আয়ারল্যান্ডে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৬৩ হাজার ৪৪৩ জন, যা ২০২০ সালে এসে এক লাখে পৌঁছেছে। এক তথ্যমতে, ২০০২ ও ২০০৬ সালের মধ্যবর্তী সময় আয়ারল্যান্ডে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৭০ শতাংশেরও বেশি। সে হিসাবে দেশটির সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ধর্ম হলো ইসলাম। আয়ারল্যান্ডের গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০৪৩ সাল নাগাদ মুসলিমরাই হবে আয়ারল্যান্ডে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক।

আয়ারল্যান্ডের মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে নানা বর্ণ ও এলাকার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। অতীতে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো থেকে এখানে মুসলমানদের আগমন ঘটে। শিক্ষার প্রয়োজনে অথবা জীবিকার সন্ধানে মুসলিমরা এখানে আসে। তাদের অনেকেই দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে। অনেকে আবার আইরিশ মেয়েদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আয়ারল্যান্ডের নাগরিকত্ব লাভ করে। ১৯৯০ সালের শুরুতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকা ও বলকান এলাকা থেকে মুসলিমরা আয়ারল্যান্ডে পাড়ি জমায়। এর মধ্যে অনেকেই অভিবাসী এবং অন্যরা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রত্যাশী। রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে নাইজেরিয়া, লিবিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, আলজেরিয়া ও অন্যান্য দেশের মুসলমানরা রয়েছে। আইরিশ অধিবাসীদের মধ্য থেকে কিছু নওমুসলিমও সেখানে রয়েছে। আয়ারল্যান্ডের মুসলিম জনসংখ্যার বেশিরভাগই সুন্নি মতাবলম্বী। *[সূত্র : মসজিদের ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, কালেরকণ্ঠ]*

সূচীপত্র

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ’র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুলাই-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০২	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৩	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৪	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৫	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৬	০৩ : ৫১	০৫ : ১৬	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৭	০৩ : ৫১	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৮	০৩ : ৫২	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৯	০৩ : ৫২	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
১০	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
১১	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১২	০৩ : ৫৪	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৩	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৪	০৩ : ৫৫	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৪
১৫	০৩ : ৫৬	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৬	০৩ : ৫৬	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৭	০৩ : ৫৭	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৮	০৩ : ৫৮	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৯	০৩ : ৫৮	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২০	০৩ : ৫৯	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২১	০৩ : ৫৯	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১১
২২	০৪ : ০০	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১১
২৩	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৬	০৮ : ১০
২৪	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৫	০৪ : ০২	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৬	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৮
২৭	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৮	০৪ : ০৪	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৯	০৪ : ০৫	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৬
৩০	০৪ : ০৫	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৫
৩১	০৪ : ০৬	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪২	০৮ : ০৫

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

HAS

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk.**25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার
এবং ইউজিসি
অনুমোদিত

মেধাবৃত্তির
সুবিধা

অনার্স প্রোগ্রাম

- **B.A in Al Quran and Islamic Studies**
- **B.Sc in Computer Science & Engineering**
- **B.Sc in Electrical & Electronic Engineering**
- **Bachelor of Business Administration**

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- **M.A in Al Quran and Islamic Studies**
- **Master of Business Administration**

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

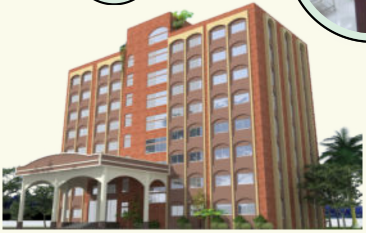

নিজস্ব খেলার মাঠ

☎ 01329-728375-78 🌐 www.iiustb.ac.bd ✉ info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং**
হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত